রক্তগোলাপ

রক্তগোলাপ

সন্তোষকুমার দে

কথাকলি
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : দেওয়ালী—১৩৬০

প্রকাশক :
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ :
এস, ক্কোয়ার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

পরিবেশক :
ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম : তিন টাকা

উৎসর্গ

ঔপন্যাসিক

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বন্ধুবরেষু

১ কার্ত্তিক, ১৩৬৭

সন্তোষকুমার দে

কথাকলির অন্যান্য বই

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্যের

তারার আঁধার—৩·৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

কস্তুরীমৃগ—৪·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৈশালীর দিন—৩·২৫

বারীন্দ্রনাথ দাসের

লালীবাজ—৪·০০

বিমল করের

মল্লিকা—৩·০০

আশাপূর্ণা দেবীর

উত্তরলিপি—৪·০০

উন্মেষ
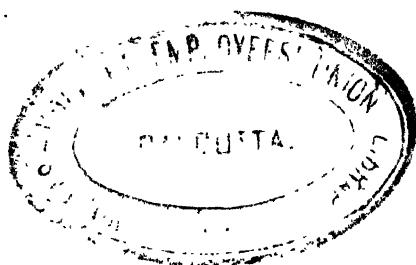
মূলঘর থেকে মানসা মাইল চারেক পথ। পায়ে হেঁটে গেলে গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলে যাওয়া যায়। হাট করতে, যাত্রা গান শুনতে, কিম্বা হাই ইস্কুলে পড়তে এক গাঁয়ের লোক হামেশা পায়ে হেঁটে অপর গাঁয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু বাড়ির বৌ-ঝি ছেলে-পুলে সবাইকে নিয়ে মানসার কালীবাড়ি পুজো দিতে যাওয়ার দিন নৌকা আনা হয়। এক দাঁড়ের ছোট টাবুরে বাঁধা থাকে দুই গাঁয়ের মাঝামাঝি ফকিরহাটের গঞ্জের ঘাটে। ছ' আনা পয়সা দিলে খুশি হয়ে মাঝি নৌকা নিয়ে গাঁয়ের ঘাটে আসে। ঘাটের এক পাশে একটা সরু খাল, গাঙ থেকে খালের মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে রেখে মাঝি গৃহস্থের বাড়ি যায়, মাথায় তুলে জিনিসপত্র নিয়ে আসে, সওয়ারী সঙ্গে আসে, তারপর এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে হুঁকাটা কাঁধের ভাঁজে চেপে রেখে নিশ্চিন্তে বৈঠা তুলে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে মানসার দিকে যাত্রা করে।

জল কাদা ভেঙে নৌকায় উঠতেই বা কি আরাম। তারপর গলুইয়ে বসে পা ঝুলিয়ে জলে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে পা ধোওয়া। ততক্ষণে নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। তখন 'কুমীর কুমীর' খেলার গানটা পরেশের মনে পড়ে। 'এ গাঙে কুমীর নেই, ঝাপুর-ঝুপুর।'—বলে যখন দুষ্টু ছেলেমেয়েরা শুকনো ডাঙায় মাতামাতি করে তখন যে কুমীর সাজে সে তেড়ে আসে। সচরাচর কুমীর একজন আর স্নানার্থীর সংখ্যাই বেশী। একবার উঠান থেকে বারান্দার দাওয়া ছুঁয়ে ফেলতে পারলে তাকে কুমীরের আর খাওয়া চলবেনা, বুঝতে হবে সে জল থেকে ডাঙায় উঠে গেছে। পরেশের মনে পড়ে সব

কথা। মনে পড়ে আর হাসে সে। এইতো সেদিনও সে পশ্চিম-পাড়ায় মণ্টুদের বাড়ি 'কুমীর-কুমীর' খেলে এসেছে। এক বছর পার হয়নি। পরেশ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করেছে, বড় হয়ে গেছে সে, এখন তাই 'কুমীর-কুমীর' খেলতে লজ্জা পায়। কিন্তু কুমীর-কুমীর খেলায় সত্যিই কেমন মজা লাগত। খেলতে খেলতে কখন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যেত, তখনও খেলা চলছে। আর সেই আবছা আলোয় ছুটাছুটির মধ্যে অপরাজিতা লতার ঝোপের কাছে কখন কে কার ঘাড়ে পড়ছে, কে কাকে জড়িয়ে ধরছে ঠিক নেই। একদিন দুদিক দিয়ে দৌড়ে দুজন এসে প্রবল বেগে ধাক্কা খেল—পরেশ আর মণ্টুর বোন বিনতা। ধাক্কাটা শুধু মাথায় নয়, মনেও লেগেছিল পরেশের। এই প্রথম ধাক্কা। তরুণের মনে প্রথম চৈতন্যোদয়। পরেশ কেমন আচ্ছন্নের মত হয়ে গিয়েছিল। বিনতা কি বুঝেছিল কে জানে, ফিক্ করে হেসে দৌড়ে পালিয়েছিল। অপরাজিতা লতার ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে দেখে পরেশ ফুল তুলে নিয়ে এলো দুএকটা।

মা 'মানসিক' করেছিলেন, পরেশ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হলে তিনি মানসার কালীবাড়ি পূজো দেবেন। তিনি সেই পূজো দিতে চলেছেন আজ। পরেশ নিয়ে চলেছে মাকে। ওর বাবা সময় করতে পারেননি সঙ্গে যেতে। নৌকাও কেরায়া করে এনেছে পরেশ। বাবা নৌকা দেখে ভারি খুশি, বলেছেন—এই তো পরেশ বড় হয়ে উঠেছে। ও একা একা কলেজে পড়তে যেতে পারবে, আর এখান থেকে ঐটুকু পথ মানসা—ওখানে যেতে পারবেনা মা-কে নিয়ে। মাকেও বেশ খুশি মনে হল। ছোট ভাই-বোনদের সাজিয়ে নিয়ে পরেশ মাকে তাড়া দিয়েছে, মাঝির সিধে চাল-ডাল-তেল-নুন এনে দিয়েছে। ছয় আনা পয়সার পর এটুকু তার ফাউ পাওনা, সচরাচর সওয়ারী বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে তবে নেয়। কিন্তু মাঝি আজ সারাদিন থাকবে তাঁদের সঙ্গে। মানসার ঘাটে নৌকা বেঁধে দুটি চাল-ডাল ফুটিয়ে খাবে। রোদ পড়লে বিকেলে

কি সন্ধ্যায় মা যখন বাড়ি ফিরতে চাইবেন সেই তখন ফেরা হবে। সারাদিন মানসার কালীবাড়ি থাকবেন, মায়ের প্রসাদ পাবেন, এই অনেক দিনের ইচ্ছা পরেশের মা ভবতারিণীর।

নদীর জল বয়ে চলেছে শরবনের কোল ঘেঁসে। কাঁঠালগাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নদীর ঘাটে নাইতে এসেছে। পাড়ের কাছে একখানা খেজুর গাছের গুঁড়ি ফেলে ঘাট করা। বৌ-ঝিরা ডুব দিয়ে উঠে এদিক ওদিক তাকিয়ে গায়ের কাপড় গোছাচ্ছে। একজন বৌ স্নানান্তে খেজুর গাছটার উপর দাঁড়িয়ে পরিধানের বস্ত্রে বুক পিঠ সামলে চুল ছেড়ে দিয়ে গামছায় পিটিয়ে ভিজে চুল শুকোচ্ছে। নদীটির নাম ভৈরব, কিন্তু আজ সে শান্ত, এক ফালি খালের মত মৃতপ্রায়। ওপারে অজস্র পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটেছে। ক্ষেতে মুলো হয়েছে, সরষে হয়েছে। চরের নাড়াবনে শাদা বক গলা বাড়িয়ে কি দেখছে। চরের শেষে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বড় কেয়াঝোপ, ওর তলায় কবে যেন চিতাবাঘ এসেছিল। গাঁয়ের ভুপেন ডাক্তার গুলি করে মেরেছিলেন বাঘটাকে। ওই কেয়াঝোপটার দিকে তাকালেই আজও পরেশের গা শির শির করে। একদিকে বেনেবউ ফুল ফুটে আলো করে আছে, ঢোলকলমির লতা দুলছে, কলমি ফুল ফুটেছে কত। আকাশে হালকা মেঘের সারি, দল বেঁধে বক উড়ে যাচ্ছে। খেজুর গাছে সবে দা পড়েছে, এখনও সব গাছ ছালতে পারেনি গাছিরা। শীত যত বাড়বে তত মিষ্টি হবে খেজুরের রস, সেই দিনের জন্য তৈরী হচ্ছে সবাই।

কতটুকু পথ, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো। ফকিরহাটের গঞ্জের ঘাট পার হওয়ার পর দুটো বাঁক ঘুরতে না ঘুরতে একটা গম্ গম্ আওয়াজ কানে এলো। মানসার বাজার জমে উঠেছে, দূর থেকে তার একটা গম্ গম্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। নদীর পাড় দিয়ে দুধের কেঁড়ে, মাছের ঝাঁকা, তরকারির ডালা নিয়ে পসারীদের যেতে দেখা যাচ্ছে। আর একটা বাঁক ঘুরতে অনেকগুলি উঁচু উঁচু লগি পোঁতা দেখা গেল। মানসার ঘাট। ওখানে হাটুরেদের নৌকা, যাত্রীদের

নৌকা, ব্যাপারীদের ভেসাল জমা হয়েছে। এক দাঁড়ের ছোট টাবুরে খানি একটা প্রশস্ত হালের তলা গলিয়ে ঘাটের কাছে গিয়ে ভিড়ল। পরেশ লাফ দিয়ে নেমে পড়ল, হাফ প্যান্টে লাগল একটু জল কাদা। ভাই বোনদের মাঝি ধরে নামালে, মায়ের হাত ধরে নামালে পরেশ। তাঁর হাতে পূজোর বেসাতি। মা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন,—'কিছু ছুঁয়ে দিসনে বাপু!' পরেশ হাসতে হাসতে উপরে উঠে এলো।

ঘাট থেকে বাজার পর্যন্ত একটা কাঁচা সড়ক চরের বুকে মাথা উঁচিয়ে আছে। চরের প্রান্তে সারি সারি ঢেউ টিনের ঘর, তাতে বাজারের ছোটবড় দোকান। মাঝে মাঝে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে—দূরে কোন মুসলমান বাড়ি আছে বুঝি। কিম্বা কোনও মুসলমান দোকানদারের ঘরে মোরগ ডাকছে। হিন্দুরা এ অঞ্চলে কখনই মোরগ পোষে না, খায়ও না। কিন্তু পাশাপাশি বাড়িতে মোরগ ডাকায় আপত্তি নেই।

মানসার কালীবাড়ির কালী জাগ্রতা দেবী। শোনা যায় কবে নাকি গাঙ্গে কোন্ মাঝি সারি গেয়ে যাচ্ছিল, শুনে মা ভারি খুশি হলেন, ডেকে বললেন—'মাঝি, নাও বেঁধে এদিকে এসে আমায় একটু গান শুনিয়ে যাও।' মাঝি হয়ত তখন দূরের সওয়ারী নিয়ে চলেছে, সে বললে—'যার গরজ সে এসে গান শুনে যাক্।' সারি গান শোনবার লোভে মায়ের দক্ষিণমুখী মন্দির নদীর দিকে মুখ করে ঘুরে গেল। পরদিন পুরোহিত এসে দেখে অবাক। তক্ষুনি হত্যা দিলে স্বপ্নে আদেশ হল—'আমি সারিগান শুনতে মন্দিরের মুখ ঘুরিয়েছি।' তদবধি হিন্দু মুসলমান মাঝি মাত্রেই মায়ের 'থানে পেন্নাম' করে যায়। শোনা যায়, যে যা মানত করে তার তা পূরণ হয়।

মন্দিরটির তিনটি দরোজা বারান্দার দিকে খোলা। মাঝের দরোজাটি বড়, সেখানে পূর্ণাবয়ব শিব ব্যাঘ্রচর্ম্ম জটাজুটসহ ধরাশায়ী। বক্ষোপরে দিগম্বরা দীর্ঘাকৃতি বিশাল কালীমূর্তি। গলায় জবাফুলের মালা রক্ত স্রোতের মত স্কন্ধের উর্ধ্বদেশ থেকে নীচে ঘট পর্যন্ত বিলম্বিত। ঘটের উপর নারিকেলের শিষটিতে সিঁদুর লেপা।

অনেক ফুলের তলায় ঘট ও নারিকেল চাপা পড়েছে। ঘটের উদরের যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে তাতে দীর্ঘকাল সিঁদুরের প্রলেপ পড়ে পড়ে পুরু হয়ে গেছে। মায়ের উপরের দক্ষিণ হাতে বরাভয়, বাম হাতে খড়্গ, নীচের দক্ষিণ হাতে জপের মালা আর বাম হাতে সদ্যকর্তিত নরমুণ্ড। গলায় মুণ্ডমালা, কোমরে কর্তিত হাতের মালা। করাল-বদনী কালীর মুখে কিন্তু এক অনিন্দ্য হাসির অস্ফুট বিচ্ছুরণ। তাকিয়ে থাকলে ভক্তমন আপনিই নত হয়ে প্রণাম করে। ডাইনে বামে প্রেতিনী। একটি শিবা উর্ধ্বমুখ হয়ে মায়ের হস্তে ধৃত কর্তিত মুণ্ডের রক্ত লেহন করছে মনে হয়।

দেবীর বামে পৃথক বৃষারূঢ় শিবের মূর্তি। বৃষের উদরের তলায় একটি ছোট শিশু। ছোটবেলায় পরেশ ভাবত, ওই ছোট ছেলেটা কেন ষাঁড়ের পেটের তলায় বসে আছে, ওর ভয় করে না? এখন ভাবছে, বুদ্ধিমান কুম্ভকার বৃষের উদরের তলায় ঠেকনার কাঠটা ঢাকবার জন্যে একটি সুন্দর শিশু মূর্তি বসিয়ে দিয়েছে।

দেবী মূর্তির দক্ষিণে নারায়ণ শিলার সিংহাসন, তাতে সুন্দর চন্দ্রাতপ।

তিনটি মূর্তির সম্মুখেই ঘট পাতা, ঘটের চারিদিকে তীরকাঠি পোতা, তাতে লাল সুতো জড়ানো। ঘটের মুখে আম্রপল্লব ও সশিষ ডাব। তার উপর ঘটের গায়ে আমের পল্লবে সিঁদুর লাগানো। ঘটের গায়ে সিঁদুরের পুতুল আঁকা।

মন্দির হতে ধূপ ধুনা এবং ফুলচন্দনের মৃদু সৌরভ বেরুচ্ছে। উঠানের হাড়িকাঠে কিছুক্ষণ আগে দুটি বলি পড়েছে, তার রক্তের দাগ রয়েছে। দুবারের দ্বিখণ্ডিত কলার তেড় পড়ে রয়েছে। রক্তের ছিটে লেগেছে মন্দিরের বারান্দায়, সিঁড়িতে। উঠোনের ধূলোর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে আছে, মাছি উড়ছে সেখানে। পূজার্থীর ভিড়ে ভরে গেছে মন্দিরের ছোট বারান্দাটি। মন্দিরের চত্বরেও লোকের ভিড। পরেশ ভাইবোনদের নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো।

মায়ের মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য দিয়ে ভাইবোনদের কিছু গরম জিলিপি খাইয়ে আনবার জন্য পরেশ যখন গোপাল ময়রার দোকানের দিকে যাচ্ছে তখন দেখলে মন্দিরের চাতালের দক্ষিণ দিকে পুকুরের ঘাটের পাশে বেলতলায় বহু লোকে ভিড় করেছে। সেখানে ধুনি জ্বেলে বসে আছেন একজন সন্ন্যাসী। কোমরে কৌপীন, আর আছে এক গাছি দড়া, মোটা কাছির মত দেখতে। সন্ন্যাসীর সারা গায়ে ছাই মাখা। ধুনির পাশে একখানি লোহার ত্রিশূল পোঁতা, ত্রিশূলের মাথায় সিঁদুর লেপা। ধুনির পাশে পড়ে আছে চকচকে লোহার চিমটে খানি। অনেকে অনেক কিছু উৎসর্গ করছে—সন্ন্যাসীর কোন দিকে লক্ষ্য নেই। পরম নিস্পৃহের মতো বসে আছেন তিনি। মুখে একটি প্রসন্ন উদার হাসি। ভিড় ঠেলে পরেশ তাঁর কাছে যেতে পারল না। দূর থেকেই প্রণাম করলে, ভাইবোনদের প্রণাম করালে, তারপর চলে গেল গোপাল ময়রার দোকানের দিকে।

গোপাল ময়রা নিজে ভক্ত লোক। ফোঁটা তিলক কাটা, কুড়োজালিতে হাত ঢুকিয়ে দোকানের গদিতে বসে দিবারাত্রি হরিনাম করে। বয়স হয়েছে, মাথার চুল শনের নুড়ির মত ধপধপে শাদা। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, পরনে সরু একফালি সাদা কাপড়, লুঙ্গির মত বেড়া দেওয়া। নগ্ন গাত্র, কণ্ঠে তুলসীমালা, হাতে কুড়োজালি। তার দোকানের বড় দেয়াল ঘড়িটার লম্বা পেণ্ডুলামও খুব ধীরে ধীরে দোলে, অনেক বিলম্বিত স্বরে ঢং, ঢং করে ঘণ্টা বাজায়। ঘড়িটিও যেন গোপাল ময়রার মত ধীর স্থির হয়ে টক্ টক্ শব্দ করে নাম জপ করছে।

গোপাল ময়রার নাম এ অঞ্চলে সবাই জানে। তার কাছে ছানার জিলিপি কিনে খেয়ে গেছেন স্বয়ং ননীচোরা কেষ্ট ঠাকুর। এ কাহিনী পরেশ ছোটবেলা থেকে শুনেছে। গোপালের তখন বয়স কম, কিন্তু জাত বোষ্টমের ছেলে সে, দেব দ্বিজে পরম ভক্তি ছিল তার। একদিন একটি বালক এসে তার কাছে ছানার জিলিপি চাইল। গোপাল তাকে জিলিপি দিয়ে দাম চাইলে সে হাতের একটি বালা

খুলে দিয়ে বলে গেল, তার বাবা এসে পয়সা দিয়ে বালা নিয়ে যাবে। গোপাল শুধাল, তোমার বাবা কে? ছেলেটি বললে,—বাবাকে চেননা তুমি, ওই যে বালকদাস বোষ্টম গো। মানসার কালীবাড়ির বাজারের অল্পদূরে বোষ্টমদের আখড়ায় থাকত ভিখারী বালকদাস। তার জীর্ণ কুঁড়ের মধ্যে কেউ কোনদিন যায়নি।—সে নাকি একটি নাড়ুগোপাল মূর্তির পূজা করত, তাকে নাওয়াত, খাওয়াত, ঘুম পাড়াত, আবার বর্ষার রাতে তার ঘরের ফুটো চাল দিয়ে জল গড়াতে থাকলে বালকদাস তার নাড়ুগোপালকে কোলে করে একবার ঘরের ওপাশে, একবার ঘরের এপাশে বিছানা টানতো, শেষ পর্যন্ত হয়ত বালগোপালকে কোলে করে ঠায় বসে থেকে রাত কাটাতো।

ভিক্ষা করে ফিরবার পথে গোপাল ময়রার দোকানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় গোপাল বালকদাসকে ডেকে বললে ঘটনা। বালকদাস বিশ্বাস করলনা ঘটনাটা, ছুটে সে তার কুঁড়েয় গেল এবং তক্ষুনি তার বালগোপালকে কোলে করে ফিরে এলো। ছোট্ট মৃন্ময় মূর্তি, কিন্তু কি আশ্চর্য—তার একহাতে বালা নেই। বালকদাস কেঁদে লুটিয়ে পড়ল, ওরে গোপাল, তুই কি ভাগ্যবান—সে তোর হাত থেকে জিলিপি চেয়ে খেয়ে গেল, আর আমি তাকে একটু চোখেও দেখতে পাইনে! শুধু কানে শুনি। কথা বললে কথার জবাব দেয়, কিন্তু এমন দুষ্টু, হাড়-বজ্জাত, যে কখনই ধরা দেয় না।

তদবধি গোপাল শিশুদের দেখলেই ডেকে খাবার খাওয়ায়, কারো কাছে পয়সা পায়, কারো কাছে পায় না। পরেশ ছোটবেলায় কতবার এসেছে বাবার সঙ্গে গোপাল ময়রার দোকানে।

আজ ভাইবোনদের ছানার জিলিপি কিনে দিয়ে পরেশ একখানা হাতলভাঙ্গা চেয়ারে চুপ করে বসে রইল। গোপাল হাতের মালাটার জপ শেষ হলে থলেশুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে গলায় কুঁড়োজালিটি ঝুলিয়ে বললে—তুমি কিছু খাবেনা পরেশ?

পরেশ বললে—দাদু, ওই বেলতলায় এক সন্নিসি এয়েছে দেখেছ?

গোপাল বললে—মৌনী সন্নিসি, পরিব্রাজক।

পরেশ বিমনা হয়ে রইল। ভাইবোনদের খাওয়া হলে মাকে ডেকে এনে সন্ন্যাসীকে দেখাল। তখনও সমানে লোকের ভিড় চলছে। সন্ন্যাসী মৌন, কা্রো কোন প্রশ্ন শুনছেন বলেও মনে হয় না।

মায়ের প্রসাদ পাওয়ার জন্য যখন ডাক পড়ল নেহাৎ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভাইবোনদের নিয়ে উঠল পরেশ। পাত পড়েছে কৃষ্ণকলি গাছের তলায়। দলে দলে লোক বসে পড়েছে। খেতে বসেও মন পড়ে রইল ওই সন্ন্যাসীর কাছে। উনি কি তান্ত্রিক কাপালিক? উনি কি শবসাধনা করেন? এ কি এক রহস্য যেন টানছে পরেশকে। এতদিন মানসার কালীবাড়ির এই মন্দিরের মুখ ঘুরে নদীর দিকে হয়ে যাওয়ার, কিম্বা গোপাল ময়রার হাত হতে স্বয়ং বালক শ্রীকৃষ্ণের ছানার জিলিপি গ্রহণের অলৌকিক কাহিনী শুনে শুনে যেন অনেকটা গা সওয়া হয়ে এসেছিল। প্রথম প্রথম গোপাল ময়রাকে দেখে যেন রোমাঞ্চ হত, এখন আর তা হয় না পরেশের। কিন্তু ওই সন্ন্যাসীর কথা ভাবতেই অনেক দুর্জ্ঞেয় অবাস্তব কিম্ভূত চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সে যদি চলে যেতে পারত ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে। কত দেশ, কত বন, পাহাড় নদী মরুভূমি পার হয়ে চলে যেত সাধনার গহন অরণ্যে নিভৃত গুহাগহ্বরে। হ্রীং ধ্রীং শ্রীং…দুরুচ্চার সব মন্ত্রের মহিমায় একদিন তারও চিত্তকমল বিকশিত হত। ইড়া-পিঙ্গলা সুষুম্নার শিরা উপশিরা বেয়ে ঊর্ধ্বরেতঃ সাধকের চরম চৈতন্য লাভ হত। লোকালয়ে যদি ফিরত—ফিরত জ্ঞানী যোগী সিদ্ধপুরুষ হয়ে মুমূর্ষুকে প্রাণ দিতে, রোগীকে নিরাময় করতে, অসাধুকে সাধু করতে, পৃথিবীর সব পাপ তাপ ধুয়ে মুছে নির্মল করতে। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি হবে পরেশের? বিমনা হয়ে সে ভাবেই শুধু, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারে না। মায়ের হাত, ভাইবোনের হাত ছেড়ে দিয়ে ধুনির কাছে ধুলার পরে যোগাসনে গিয়ে বসে পড়তে পারে না। কিসের সঙ্কোচে যে বাধা পায় নিজেই জানে না, তবু স্বস্তিও পায় না কিছুতে।

ক্রমে ছুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেলের দিকে এ গাঁয়ের মেয়েরা কালীবাড়ি সন্ধ্যারতি দেখতে আসেন, কেউ কেউ একটু হয়ত সকাল করেই আসেন, দোকান থেকে ভোগের চিনি বাতাসা কিনে নিয়ে আসেন। বাতাসা—শুধু বাতাসা, কিন্তু চিনি আর বাতাসা একত্র করলেই তা দেবতার ভোগ হয়ে ওঠে এমন একটা বিচিত্র অনুভূতি আছে পরেশের। শটির পাতায় পোঁটলা বাঁধা সন্ধ্যার ভোগ সেও কিনে নিয়ে এলো দোকান থেকে।

এসে দেখে মা খুব জমিয়ে গল্প করতে বসে গেছেন। পরেশ আসতেই ডেকে বললেন—এই যে পরেশ এসে পড়েছে। পরেশ দেখে—তার বন্ধু মণ্টুর মা ও বোন বিনতা সেখানে বসে। মণ্টুর মামাবাড়ি মানসা গ্রামে। মণ্টুর মা বাপের বাড়ি এসেছিলেন, মেয়ে নিয়ে বেলাবেলি চলে যাবেন বলে কালীবাড়ি প্রণাম করতে এসেছেন। পরেশের মা তার সইকে পেয়ে বললেন—ব্যস্ত হয়ে এখুনি যাবে কেন, আমাদের নৌকায় একসঙ্গে যাবে। মায়ের সন্ধ্যারতি দেখে যাবো চলো। মণ্টুর মা রাজি হয়ে বসেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হল, আকাশে উঠল সন্ধ্যাতারা। দূর থেকে সন্ন্যাসীর ধুনির আগুন দেখা যেতে লাগল। কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। মায়ের আরতি সুরু হল, শেষও হল এক সময়ে। ঝন্ ঝন্ প্রখর বাদ্যে, ঘন ধূপ গুগ্গুলের ধোঁয়া ও গন্ধে সমস্ত পরিবেশ আচ্ছন্ন করে রম্ রম্ করতে লাগল। পরেশের চৈতন্যও যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এই রাতে অন্ধকারে সে যদি ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে পালিয়ে যায়?

মা কাঁদবেন, ভাইবোনেরা কাঁদবে, বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন, সমস্ত সংসারে ঝড় বয়ে যাবে। তার অমন মা, একদিনও তার মুখে আর হাসি ফুটবেনা। না না, পরেশ পারেনা এমন নিষ্ঠুর হতে। যাবেনা সে মাকে ছেড়ে, কিছুতেই যাবেনা।

বিমনা হয়েই সে নৌকায় উঠল, আর সবাইও উঠলেন। ভাই বোনেরা একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরেশেরও ঘুম আসছে। সে

শুয়ে পড়ল ছইয়ের অন্ধকারে। দুই সই বসে সুখ দুঃখের কথা বলতে লাগলেন। গাঁয়ের ঘাটের চেনা মাঝি, কোন ভয় নেই।

পরেশের চেতনা সেই তরল অন্ধকারে যেন ডুবে গিয়েছিল, একসময় ধীরে ধীরে সে আবার ভেসে উঠল। কে তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মায়ের হাত নয়—এ হাত কচি নরম। ভাই বোনদের নয়—তারা ঘুমুচ্ছে। এ হাত তবে কার।

হাত দিয়ে সে স্পর্শ করে বুঝতে পারল। চকিতে মনে পড়ল—অপরাজিতা লতার ঝাড়ের পাশে বছরখানেক আগে ঠোকাঠুকি হয়ে বিনতাকে সে ধরেছিল, বিনতাও ধরেছিল তাকে। এ সেই হাত।

পরেশ জানতে দিলনা সে জেগে আছে। নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে সে অনুভব করতে চেষ্টা করল—হাতটা কার।

আবার হাতটা তার মাথায় মুখে বুলিয়ে দিতে লাগল কোমল স্নেহস্পর্শ। তারপর পরেশের হাতখানিই কে দুহাত দিয়ে মুঠোর মধ্যে নিয়ে তার নিজের মুখে গণ্ডে আলতোভাবে লাগালে, এবং দুখানি উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ পেল পরেশ তার তপ্ত হাতের উপর।

পরেশের চেতনার সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল, তার বুকের ভিতর তোলপাড় হতে লাগল, কিছুতেই অপরাধীকে হাতে নাতে ধরতে পারল না, সে নিঃশব্দে নিদ্রিতের মতো পড়ে রইল।

শুয়ে শুয়েই অনুভব করলে পরেশ অদৃশ্য এক সূক্ষ্ম তন্তুজালে তাকে আষ্টেপৃষ্টে কে বাঁধছে। সে বন্ধনে বেদনা নেই, যেন অশেষ আনন্দ আছে। সে বন্ধনেই বুঝি সাধারণের সমগ্র জীবন বিধৃত। দুরাগত বংশীধ্বনির মত এক অনির্ণেয় আনন্দে সে আবিষ্ট হয়ে গেল। চলচ্চিত্রের ছায়াপটে ক্রমবিলীয়মান ছবির মত তার মন হতে মানসার কালীবাড়ি, গোপাল ময়রা এবং সন্ন্যাসীর ছবি ধীরে ধীরে মুছে গেল। মুছে গেল ক্ষণকাল আগে ভাবা মা-বাবা ভাই-বোনের ছবি। অন্ধকারের অতল গহ্বর হতে উঠে এসে সমগ্র পর্দা জুড়ে ভেসে উঠল—একখানি কোমল লাজুক মুখ—সে মুখ অপরা-জিতা লতার ঝোপের পাশেই পরেশ দেখেছিল, সে মুখ বিনতার।

সঙ্গিনী

আমাদের পথের মোড় ঘুরলেই বড় রাস্তার উপর একটা প্রকাণ্ড ঝাউগাছ ; কত কালের কেউ জানে না। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, ওটা নাকি ত্রেতা যুগের গাছ। কী জানি, জটায়ু পাখীর বাসা ছিল হয়ত ওর ডালে। রাম লক্ষ্মণ খেলেছেন ওর তলায়।

ঝিরি ঝিরি পাতা তলায় ছড়ানো। মাঝে মাঝে বড় বড় ফলও পাওয়া যায়। বিনি ফলগুলি কুড়িয়ে কোঁচড় ভর্তি করে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে। এই ফলে অনেক দরকারি কাজ সিদ্ধ হয়। চমৎকার জপের মালা তৈরি করা যায়, আবার দরকার হলে কাঁঠালতলার রান্না-ঘরে ওই ফল দিয়ে ঝোল-ঝাল-অম্বল কত কিছু রান্না করাও যায়।

আমি বলি—বিনি, গাছের কোটরে সাপ থাকে, মাঝালি, ডেঁয়ে পিঁপড়ে—এ সবও থাকে। ওখানে বসবিনে কক্ষনো, কামড়াবে।

বিনি মুখ ভেংচে বলে—ধ্যেত্। তোর খালি ভয়।

ঝাউগাছে শন্ শন্ করে বাজনা বাজে। আমি বিনির রান্নাঘরের চাল সংগ্রহ করে আনি। ঝাউয়ের ঝিরি ঝিরি ঝরে-পড়া পাতায় চমৎকার চাল হয়। তা-ছাড়া একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। শেয়ালকাঁটা সংগ্রহ করলে ঠিক রান্নার মসলা জিরের মতো দেখায়। আর পাকা পেঁপের কালো বীজ শুকোলে দিব্যি গোলমরিচের কাজ চলে। যেদিন এ তুটি জিনিস গুছিয়ে দিলাম—বিনি কি খুশি। আমায় নেমন্তন্ন করে পাত পেতে খেতে বসিয়ে দিলে। রান্না, দেওয়া-থোওয়ায় সে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! বড় কচুর পাতা পেতে কাঁঠালের পাতায় লুচি দিলে গরম গরম, মাছ, মাংস কত কিছু খাওয়ালে বিনি। তারপর তুজনে বেরিয়ে পড়া গেল।

এক পাঠশালে পড়তাম দুজনে। বিনি ছিরু কাকার মেয়ে। ছিরু কাকার অবস্থা ভালো নয়। খালি গায়ে, খালি পায়ে শুধু একখানি শাড়ি জড়িয়ে বিনি পাঠশালে যেত। ফ্রক তখনও তত চালু হয় নি। যাওয়ার পথে বিনি আমাকে একটি অপূর্ব জিনিস খাওয়ালে। পথে সীতানাথ ডাক্তারদের বড় বাগানটা বেওয়ারিশ পড়ে আছে। ছাড়া গরু বাছুর ঘুরে বেড়ায়। পায়ে চলা পথে সেই জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল বিনি। বউটুলি, কুসুমিকা ফুল ফুটেছে বিস্তর। ছোট ছোট দাঁতন গাছ ভর্তি। বিনি বসে পড়ে কুড়িয়ে তুলতে লাগল—ছোট ছোট তেঁতুলের ছড়া। কি মিস্টি খেতে। তেঁতুল এত মিষ্টি হয় তা কি জানি আগে? বিনিই দেখালে। তাকিয়ে দেখি দূরে চারিদিক অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে ইয়া-বড়া আদ্যি কালের যক্ষীবুড়ীর মতো এক বিরাট তেঁতুল গাছ। তারও ঝিরি ঝিরি পাতা। অনেক উঁচু। কোথায় যে তেঁতুল ফলে আছে চোখে পড়ে না। কিন্তু সেই তেঁতুলের ছড়া বাদুড়ে খায়, তলায় ছড়িয়ে ফেলে। কিছু গোটা ছড়াও ঝরে পড়ে। সেইগুলি কুড়িয়ে আনে বিনি।

আমি বললাম—তুই খোঁজ পেলি কি করে?

—গরু খুঁজতে এসে, বললে বিনি। ওদের একটা দুধেল গাই ছিল।

অম্লমধুর সেই স্বাদটির সঙ্গে বিনির শৈশবের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। একদিন তেঁতুল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ও আমার হাত কামড়ে দিয়েছিল। দোষ ছিল আমারই। তার কুড়ানো সম্পত্তি আমি কেড়ে নিয়েছিলাম। কেড়ে না নিলে সে নিজেই কিছুটা ভাগ আমাকে দিত, কিন্তু আমার তর সইল না। ফলে, ও আমার হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল। ডান হাতের পিঠে সে দাগ আজও আছে। হাতের দাগ মেলালেও মনের দাগ মুছে যেত না।

ছিরু কাকার অবস্থা তো ভালো না, কোন রকমে বিনির বিয়ে দিয়েছিলেন। তার একটি ছেলেও হয়েছিল মনে আছে। আমি

সেবার বিলেত থেকে ফিরে দেশে গিয়েছি শুনে বিনি আমায় দেখতে এলো। পাশের গ্রামেই তার শ্বশুরবাড়ি। তবু বাপের বাড়ি সে সচরাচর আসে না। আমার মা-ও ওকে অনেকদিন পরে দেখলেন। যত্ন করে বসালেন।

বিনির চেহারা একটু মলিন হয়েছে, স্বাস্থ্য ভালো নয়। কিন্তু আমাকে দেখে যেন সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ওমা—কত বড় হয়েছে কমলদা। জ্যেঠিমা, এবার কমলদার বিয়ে দাও। দিব্যি ফুটফুটে একটি বৌদি আনো। বলো তো না হয় চৌধুরীগিন্নিকে ধরি। ওদের খেন্তি বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

একা পেয়ে ওকে বললাম—সেই মিষ্টি তেঁতুল এখন পাওয়া যায় বিনি?

বিনি হাসলে—বিষণ্ণ হাসি; বললে,—তুমি এখন দেশ-বিদেশে কত কি ভালোমন্দ খাচ্ছ, সেই তেঁতুলের ছড়া কি আর মনে আছে তোমার।
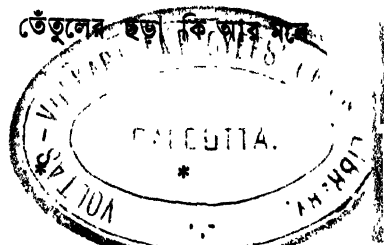
অনেক দিন পরে দেশে ফিরেছি। আজ আর আমার মা বেঁচে নেই। বাড়িতে কেউ থাকে না। বাবা অতি বৃদ্ধ হয়েছেন, তিনি কলকাতায় আমার কাছে থাকেন। শুধু তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে দেশের বাড়ি দেখতে এসেছি। বছরে অন্তত একবার এসে খাজনা শোধ করে স্বত্ব ঠিক রেখে যাওয়া দরকার। গ্রামের চৌকিদার ত্রিলোচন বেহারা আমাদের বাড়ি দেখাশোনা করে, ফল-পাকড় খায়। আমি আসবো শুনে সে বাড়িটা সাফ-সাফাই করে রেখেছে। কিন্তু এত জঙ্গল, এত মশা, এত মাছি, এত ম্যালেরিয়ার ভয় যে, আমি পালাই পালাই করছিলাম। নেহাৎ কাজকর্ম মেটাতে যেটুকু বাকি।

ত্রিলোচনের কাছে গ্রামের দুচার জনের খবরের সঙ্গে ছিরু কাকার

খবরও শুনলাম। ছিরু কাকা মারা গিয়েছেন; তাঁর স্ত্রীও নেই। বাড়িতে থাকে বিনি। তার স্বামী আবার বিয়ে করেছিল। সে সতীনের ঘরে টিকতে না পেরে বাপের পোড়ো ভিটেয় ছেলেটিকে নিয়ে চলে এসেছে। ছেলেটি গ্রামের ইস্কুলে পড়ে। কী করে ওদের চলে জানতে পারলাম না।

আজ মনে পড়ল কথাটা। কদ্রু আর বিনতা দুই সতীনের নাম—আমাদের পুরাণে আছে। একজনের সন্তান গরুড়, আর এক-জনের সন্তান সর্পবংশ। মায়েদের শত্রুতা ওদের মধ্যেও বর্তেছিল। বিনিরও নাম ছিল বিনতা। ও নামে কেউ ডাকে নি তাকে। পাঠশালার খাতাতেই লেখা ছিল। বিনতা বসু নাম ডেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দু' তিনবার। লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল বিনতা, কিন্তু কি হ'ল। ছিরু কাকা যদি বিনিকে পড়াতে পারতেন তবে হয়ত সে সহজেই অন্য মানুষে পরিণত হতে পারত। ছোটবেলা হতে দেখেছি—কী সাহসী, কী ধৈর্যশীলা, কী বুদ্ধিমতী এবং কী স্নেহশীলা ছিল বিনতা। একবার একটা ছোট তালগাছের উপর লাফ দিয়ে পার হওয়ার সময় তালের পাতার করাতে আমার হাতের কব্জিতে একটা গভীর ক্ষত হয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল। বিনি তার পরণের নতুন শাড়ি ছিঁড়ে আমার ক্ষত স্থানে বেঁধে দিয়েছিল। তাদের অবস্থা নিতান্ত খারাপ ছিল। নতুন শাড়ির কোণ ছেঁড়ার জন্য তাকে যে কী পরিমাণ তিরস্কার শুনতে হয়েছিল তা আমি কানে না শুনলেও অনুভব করতে পারি।

পায়ে পায়ে গেলাম বিনতার কাছে। যত্ন করে দাওয়ায় মাদুর পেতে বসালে। ছেলেকে ডেকে প্রণাম করতে বললে। হাতে একটু নোয়া আর সিঁথির সিঁদুরে সে তার এয়োতির পরিচয় দিচ্ছে। পরণের বসনে তার দারিদ্র্য গোপন থাকে নি। ছেলেটিরও অতি দীন করুণ মূর্তি। বিনতার স্বামী থেকেও নেই; তার নির্বোধ স্বামী তার মূল্য বোঝে নি, সম্পত্তির লোভে আবার একটা বিয়ে করে বিনতাকেই তাড়িয়ে দিয়েছে।

যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম আমি। কোথাও ভরসার এতটুকু চিহ্ন দেখতে পেলাম না। কিন্তু সহ্য করবার কী বিপুল ক্ষমতা এই ক্ষুদ্রকায়া মহীয়সী নারীর। ওর কাছে নিজেকে নিতান্ত ছোট মনে হ'তে লাগল। আমি একটু মশা-মাছির উপদ্রবে উত্যক্ত হয়ে উঠেছি, পালাই পালাই করছি, আজ না গেলেও কাল চলে যাব। আর এরা এখানেই জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে। এ সেই বিনতা, সুযোগ পেলে স্বচ্ছন্দে যে একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হতে পারত।

ছেলেটিকে তার মামাবাবুর জন্য ডাব পাড়তে পাঠিয়েছিল বিনি। আমি বললাম—তোর এই অবস্থা যে ভাবতে পারিনে বিনি। তুই আমার সঙ্গে কলকাতায় চল, তোর বৌদির কাছে থাকবি। আমাদের যা জোটে আমরা সবাই ভাগ করে খাব, একভাবে চলে যাবে।

বিনতা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বললে—তা হয় না কমলদা। আমার বাপের ভিটেয় পিদিম জ্বলবে না। তাছাড়া খোকার বাবা শুনলে বা কী মনে করবেন, দেশের লোকেই বা কী বলবে?

বিনি আমার নিজের বোন নয়, ছিরু কাকা নিতান্তই পর, প্রতিবেশী মাত্র ছিলেন। এ কথার উপর আর জোর করা চলে না।

বিনির ছেলে তার মামাবাবুকে ডাব না খাইয়ে ছাড়লে না। আমি ডাব হাতে তুলে নিলে তারও কী আনন্দ! আসবার সময় তার হাতেই কিছু টাকা দিয়ে বললাম—তুমি বইপত্র কিনো বাবা। মন দিয়ে পড়াশুনো করে বড় হয়ে মায়ের মুখ উজ্জ্বল করো।

মা-ছেলে দুজনে আমায় প্রণাম করলে। উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম বিনির চোখে জল টল টল করছে।

বনলতা সেন

ডেইলি টেলিগ্রাফের খবরটা বার বার পড়লেন, তবু যেন বিশ্বাস হয় না, সাহস পান না বিশ্বাস করতে বয়োবৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর সেন। কাগজটা ভাঁজ করে বুকের উপর ফেলে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন।

বনলতা, ডক্টর সেনের বিবাহিতা পত্নী বনলতা সেন এসে মুখোমুখি বসলেন, যেমনটি ঠিক বসতেন, যেমনটি ঠিক বসতেন তাঁদের কলকাতার বাড়িতে। চমকে উঠলেন ডক্টর সেন, চোখ মেলে তাকালেন চারিদিকে, না, কেউ নেই—ওটা দৃষ্টিভ্রম।

বয়সের জন্য দৃষ্টিভ্রম হতে পারে, কিন্তু স্মৃতিভ্রম হয় নি এখনও। আর বনলতাকে তিনি ভুলবেন কেমন করে? ডেইলি টেলিগ্রাফের খবরের সঙ্গে যে তরুণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর ছবিটি ছাপা হয়েছে, ওর চোখে-মুখে যে বনলতার ছাপ আঁকা। ও যে বনলতার একমাত্র সন্তান সোমনাথ, এখন স্বনামধন্য সোমনাথ সেন—দুরারোগ্য ক্যান্সার চিকিৎসার ঔষধ আবিষ্কারক হিসাবে ডেইলি টেলিগ্রাফের পাতায় যার ছবি আর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে আজ। আর কি আশ্চর্য, সোমনাথের পরিচয় লিখেছে—স্বর্গত বৈজ্ঞানিক ডক্টর অমিতাভ সেনের পুত্র, কৈ বনলতার নাম তো নেই?

স্বর্গত বৈজ্ঞানিক! একটা দীর্ঘশ্বাস নামলো বৃদ্ধের বুক হতে। সোমনাথ নিজেও তাই জানে, গোটা দেশের লোক তাই জানে—সোমনাথের বাবা বেঁচে নেই। কিন্তু সত্যি যদি তিনি বেঁচে না থাকতেন, তবে এই আনন্দ-সংবাদটাও তো তিনি জেনে যেতে পারতেন না?

বনলতা সেন আবার মুখোমুখি হয়ে এসে বসলেন। চেষ্টা করেও ওকে এড়ানো যায় না, এত দিনের চেষ্টাতেও যে তাঁকে ভুলতে পারেন নি, আজ ডেইলি টেলিগ্রাফ পড়বামাত্র তা' ধরা পড়েছে।

বনলতার সঙ্গে কলেজে পরিচয় হয়েছিল, উভয়েই আগ্রহ করে বিয়ে করেছিলেন। বনলতা বড়লোকের মেয়ে, অমিতাভ বনেদী জমিদারপুত্র, কোন বিষয়ে কোন রকমেই বে-মানান হয় নি—এমনই ধারণা করেছিল সবাই। উৎসবের আনন্দটা একটু স্তিমিত হয়ে আসতে না আসতে বনলতার শ্বশুর মারা গেলেন। কিছু দিনের মধ্যেই বনলতা অনুভব করলেন, এদের বাড়িটা বড়ো, কিন্তু বড়োই অগোছালো! একটা ভালো বৈঠকখানা নেই-যে কোনও ভদ্রলোক এলে বসানো চলে। সেই পুরাতন আমলের আসবাবপত্র, নোংরা একবোঝা জঞ্জালের মতো মনে হল তার কাছে।

নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি এক অঞ্চল পরিষ্কার করিয়ে নতুন আসবাবপত্রে সাজালেন। তারপর দৃষ্টি পড়ল বাড়ির ভিতরের দিকে। কর্তার আমল থেকে অনেকগুলি পোষ্য ছিল বাড়িতে। বনলতা সবাইকে বিদায় দিতে চাইলেন, অমিতাভ রাজী হলেন না। অগত্যা মাঝামাঝি রফা হল, দেউড়ীর দিকে একটা দোতলা খালি পড়ে ছিল, সেখানে ঐ দঙ্গল পাঠিয়ে দেওয়া হল, অমিতাভ গোপনে তাদের মাসোহারা বজায় রাখলেন।

বাড়ি পরিষ্কার হলেও শান্তি এলো না। ততদিনে সোমনাথের জন্ম হয়েছে। সোমনাথ ছুটাছুটি করে খেলা করতে শিখেছে। হামেশাই গিয়ে মিশছে দেউড়ির দিকে দোতলার বাসিন্দা ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। অমিতাভ তাঁর অধ্যাপনা, পড়াশুনা ও গবেষণা নিয়ে ডুবে আছেন, ঘর-সংসার বা ছেলের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার তাঁর ফুরসুৎ নেই! কিন্তু বনলতা তো ছেলের ভবিষ্যৎ উপেক্ষা করতে পারেন না! তিনি দাবী জানালেন, ঐ পোষ্যবর্গকে বাড়িছাড়া করতে হবে। একে ওরা বয়সে অমিতাভের চেয়ে অনেক ছোট, তাতে বাবার মামাতো ভাইয়ের ছেলে ও নাতি ওরা, নিকট-আত্মীয়—কি ভাবে

ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা যায়, বিশেষ করে কারণও যখন নিতান্ত নগণ্য—ওদের ছেলেদের সঙ্গে সোমনাথ যাতে না মেশে। চক্ষুলজ্জায় কথাটা অমিতাভ অপর পক্ষকে বলতে পারছিলেন না কিছুতেই। কর্তাদের আমল থেকে ওরা এ-বাড়িতে আছে, নিজেরা যায় ভালো, কিন্তু গায়ে পড়ে চলে যেতে বলা দুরূহ। কিছুতেই তিনি সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না, অথচ বনলতার দাবীও তিনি সাহস করে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। চাপে পড়ে তিনি স্বীকার করেছেন—ওদের চলে যেতে বলবেন, বনলতা সেই প্রতিশ্রুতি বার বার স্মরণ করিয়ে দেন।

কলকাতায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল, অমিতাভ অধিবেশনে বৈদেশিকদের বক্তৃতা শুনে উৎফুল্ল মনে বাড়ি ফিরে দেখেন—বনলতা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বসে আছেন। বাইরের ঘরেই দেখা হয়ে গেল। অমিতাভ সোজা ভিতরে যাচ্ছিলেন, বনলতা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কোথায় যাও, আগে আমার কথার জবাব দাও। তুমি উকিলের বাড়ি গিয়েছিলে?

হাঁ-না কিছু জবাব দেওয়ার আগেই তিনি আবার তর্জন করে উঠলেন,—সময় পাওনি, কেমন? মিথ্যাবাদী, লম্পট, কাপুরুষ কোথাকার! আমি জানি, তুমি যাও নি—উকিলকে আমিই ডাকিয়ে এনেছিলাম। এ বাড়ি আমার নামে তোমার বাবা দানপত্র করে দিয়ে গিয়েছেন, আমি যাকে খুশি তুলে দিতে পারি—বললেন উকিল। সে উইলের কথা তুমি জানতে তবু আমায় বলো নি—কপট, স্বার্থপর, অপদার্থ! এমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা ভালো, তবু বুঝি আমি বিধবা,—আমার সব ব্যবস্থা আমার নিজেকেই করতে হবে।

রাগে ফুলতে লাগলেন বনলতা, যেন একটা ক্রুদ্ধ কেউটে, এখুনি ছোবল মারবে। অমিতাভ কি জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, ছোবলটা সেই মুহূর্তেই পড়ল, চীৎকার করে উঠলেন বনলতা—আমার সুমুখ থেকে বেরিয়ে যাও, ক্লীব, কাপুরুষ, মেনীমুখো মানুষ,

বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—আর কখনো এসো না, দূর হয়ে যাও—থাকো গিয়ে তোমার সোহাগের ভাইপোদের কাছে।

পিছনে যখন দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা, তখন অমিতাভ বুঝতে পারলেন কখন তিনি পায়ে পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন। তখনও তাঁর পা কাঁপছে, বুক কাঁপছে। তাঁর মন বলছে—ভগবান, আমায় অন্ধ করে দাও, যেন এই চোখ খুলে আর কোন মানুষের মুখ দেখতে না হয়, কালা বধির করে দাও, যেন আর কারো কোন কটু ভাষণ কানে না আসে।

কতক্ষণ এভাবে কাটল কে জানে, ইতিমধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে তিনি রাস্তায় নেমে এসেছেন—ট্যাক্সি ডেকেছেন একটা, চলে এসেছেন হাওড়া ষ্টেশনে। সেখানে এক জন ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল, তার সাহায্যে রাঁচির একখানা টিকিট কিনে ট্রেনে উঠে বসলেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন ট্রেনের দোলায় কখন ঘুমের অতলে ডুবে গেল, তিনি টেরও পেলেন না।

যখন আকস্মিক ভাবে ঘুমটা ভাঙ্গলো তখন সম্যক অবস্থাটা বুঝে নিতে কিছুটা দেরী হল। একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনার মধ্যে ট্রেনের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গেছে, মনে হয় যেন দুঃস্বপ্ন—কিন্তু ঘটনাটা যে নিতান্তই নিষ্ঠুর সত্য, তা বুঝতেও বেগ পেতে হল না। নানা বস্তুপুঞ্জের চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে নিতে খোলা আকাশের নীচে চাঁদের আলোয় ক্রমে সব স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

সহযাত্রী এক ভদ্রলোক ঘন ঘন ধূমপান করছিলেন মনে আছে, তার খোঁজ নিতে গিয়ে অমিতাভ শিউরে উঠলেন, মুখখানা থেঁতলে কদাকার বিকট রূপ ধারণ করেছে—তাকে আর কোন বিশেষ মানুষের মুখ বলে মনে করবার উপায় নেই। ভদ্রলোকের স্ত্রী আর শিশু পুত্রও রেহাই পায় নি। ওদের দেখে এক বার বনলতা আর সোমনাথের মুখ মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বনলতার সেই ভয়াবহ মূর্তি। মুহূর্তে অমিতাভ কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। নিজের পকেটের ডায়েরি ঢুকিয়ে দিলেন সেই মৃত ভদ্রলোকের জামার পকেটে, আর তার

পকেট থেকে সব কাগজপত্র বের করে নিলেন এবং তার স্ত্রী ও পুত্রের মৃতদেহ সরিয়ে অন্য গাড়ির আড়ালে রেখে এলেন। লোকজন এসে পড়বার আগে খোলা প্রান্তরের বুকে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

যে ছাত্রটি তাঁকে রাঁচির টিকিট কেটে দিয়েছিল সে যখন ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতের তালিকায় ডক্টর অমিতাভ সেনের নাম দেখেছিল, তখন বনলতার সঙ্গে হয়ত দেখা করেছিল। সন্ধান নিয়ে জেনেছিলেন ডক্টর সেন, বনলতা তার মৃত স্বামীর লাইফ-ইনসিওরেন্সের টাকা পুরা পঞ্চাশ হাজারের কিছু বেশি এককালীন পেয়েছিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে সাগর পাড়ি দিলেন। সোমনাথের ভবিষ্যৎ ছেড়ে এলেন তার মায়ের হাতে।

কত কাল ওদের সংবাদ পাওয়া যায়নি, ইচ্ছা করলেও নেওয়া উচিত বোধ হয় নি। যে লোক মরে গেছে বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে তার আবার স্নেহবন্ধন কেন? লণ্ডন সহর থেকে দূরে অখ্যাত পল্লী অঞ্চলে তিনি দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাস করছেন, ছেলেদের ইস্কুলে পড়ান আর প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে সোমনাথকে প্রত্যক্ষ করেন। এখানে তাঁকে কেউ জানে না, কেউ চেনে না যে তিনিই বৈজ্ঞানিক ডক্টর সেন। এখানে তিনি পরিচয়হীন নগণ্য এক জন ভারতীয় মাত্র। দিন এক ভাবে কাটছিল।

গোল বাধালো ডেইলি টেলিগ্রাফের সংবাদ—ডক্টর অমিতাভ সেনের পুত্র তরুণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডক্টর সোমনাথ সেন দুর্জয় ক্যান্সার রোগ নিরাময়ের উপায় আবিষ্কার করেছেন।

ওকে এক বার দেখতে সাধ হয়, ও কত বড় হয়েছে, সত্যি সেই ছোট্ট সোমনাথ দশের মধ্যে মাথা উঁচু করে বড়ো হয়ে উঠেছে, আবিষ্কার করেছে দুরারোগ্য দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ক্যান্সারের প্রতিকার, এ ভাবতেও যে বুক আনন্দে ফুলে ওঠে! দু-হাত দিয়ে বৃদ্ধ খবরের কাগজখানাই বুকে চেপে ধরেন, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মনে তবু একটা প্রশ্ন জাগে—বনলতা, বনলতা আজ কি ভাবছে? সোমনাথ কি তার মায়ের দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি নিরাময় করতে পারে নি?

[illegible]ত দিল
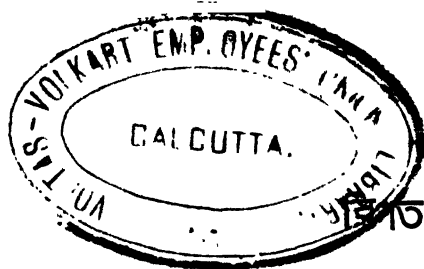
পাশের থানায় পুড়ছিল বাড়ীঘর, খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল গরু বাছুর, রাস্তা-ঘাট নদীনালা সর্বত্র কিলবিল করছিল অস্ত্রধারী আততায়ী—এই সংবাদ শুনে এ গাঁয়ের বাসিন্দাদের একদলের গেল মুখ শুকিয়ে। সাত পুরুষের বাস্তুভিটা, এ থুয়ে নড়েনি জীবনে কোন দিন, দেখেনি বড় গাঙ্গ পেরিয়ে আছে কোন্ রাজ্য ! জন্মে অবধি এই গাঁয়ের মাটিতে মানুষ, এখানেই তাদের সহজ অধিকার, অগাধ আশ্বাস। এখানেও যে এমন কিছু ঘটতে পারে যাতে সব ছেড়ে যে যেদিকে পারে পালাতে বাধ্য হবে এমন দুঃস্বপ্ন দেখেনি কেউ। আর যাবে বললেই বা যাবে কোথায়, কোথায় আছে আশ্রয় ?

মাহিন্দির ওদের মধ্যে একটু চটপটে। ছোটবেলায় যাত্রার দলে বালক সাজতো, গলায় সুর ছিল। যাত্রার দলের সঙ্গে ঘুরত নানা দেশ, দেশের কত বন্দর-বাজার-গ্রাম-বসতি। সব পথ-ঘাট তার মনে নেই, তবু বিশ্বাস আছে, যদি দরকার হয় সে নৌকা খুললে চলে যেতে পারবে কোন ভিন্ গাঁয়ে। জোয়ান চেহারা, আর কিছু না পাক, ইষ্টিমারের ঘাটে কুলির কাজ করেও কি গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করতে পারবে না ?

কিন্তু মুস্কিল হয় মাকে নিয়ে। অবশ্য মেনকার কথাও ভাবতে হয় কিছু।

মা বুড়ো মানুষ, নড়তে চায় না স্বামীর ভিটা ছেড়ে। এঁটেল মাটি লেপা তুলসী তলায় গড় হয়ে প্রণাম করে বুড়ী নিশ্চিন্ত হয়ে গোরুর জাব মেখে দেয়, তারপর খেজুর পাতার পাটি বুনতে বসে।

মেনকা তারক খুড়োর মেয়ে, মাহিন্দির তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মাহিন্দিরের মায়েরও পছন্দ। কিন্তু বুড়ো তারক টাকা না পেলে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কেউ সদুপদেশ দিতে এলে বুড়ো দাঁত খিঁচিয়ে এক কাহন শুনিয়ে দেয়। এ বছরের খন্দ তুলতে পারলে আশা ছিল মাহিন্দির টাকার জোগাড় করতে পারবে। কিন্তু যেমন শোনা যাচ্ছে চারিদিকে, তাতে কখন যে তাদের গাঁয়েই কি হয় ঠিক কি?

পথে মেনকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাহিন্দির বললে,—শুনেছিস্ চাদ্দিকে কি সব হ্যাঙ্গাম হচ্ছে।

মেনকা মুচকি হেসে বললে—তার তুমি কি করতে চাও?

পালিয়ে যেতে চাই। তোর বাবা কি করবে ঠিক করেছে?

বাবা যাবে কোথা? মা আছে, আমরা ভাই-বোনেরা আছি, গোরু-বাছুর, জমি জেরাত আছে। এ সব ফেলাইয়া বাবা যাবে কোথা?

মাহিন্দির বুঝিয়ে বললে—গোরু-বাছুরের মায়া না করে প্রাণ নিয়ে বাঁচাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ।

মেনকা অবহেলার হাসি হেসে বলে—তুমি পালাও।

কিন্তু কারো পালানো হল না।

সন্ধ্যার আগেই তারা এসে পড়ল। অগুণতি লোক, কেউই খালি হাতে আসেনি। জ্বলন্ত মশাল হতে আগুন লাগাল চাষীদের চালাঘরে। খড়ের ঘর, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। গরিব গেরস্ত যারা তারা তাদের ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙ্গা বাসনের মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে এলো পথে। কিন্তু তারক সম্পন্ন চাষী। তার চারটা ধানের মরাই, চারদুয়ারী বড় টিনের ঘর জিনিষপত্রে ঠাসা। হায়-হায় করে উঠল তারক, ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে এলো তারকের স্ত্রী। কোলের বাচ্চাটা উঠল ডুকরে কেঁদে। ভিড়ের ভিতর হতে মেনকার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কে। মাহিন্দির যখন ছুটে এলো তখন আর মেনকাকে খুঁজে পেল না।

ঝিম ঝিম করছে রাত। একটা গাছ তলায় জড়ো হয়ে বসে আছে গ্রামের ক'জন লোক—বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ। কালই তাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে হবে, নতুবা মৃত্যু!

মাহিন্দিরের মাথাটা চন্ চন্ করছে। অনেক ঘুরেও মেনকার খোঁজ পায় নি সে। হদিশ মিলেছে কিছু—সেটা না শুনলেও ক্ষতি ছিল না। পরাণ বেহারা দেখেছে মেনকাকে ধরে নিয়ে যেতে। যারা নিয়ে গেছে তারা নিরস্ত্র নয়, তারা ছেড়েও দেবে না! হয়ত তাদের কেউ বিয়ে করতে চাইবে মেনকাকে, কিন্তু সে কি তাতে রাজি হবে?

হাঁটু হতে মাথা তুলে দেখলে মাহিন্দির। খানিক দূরে তারক মাথায় গামছা জড়িয়ে পড়ে আছে। বাধা দিতে গিয়েছিল সে আর তার বড় ছেলে যোগিন্দির। যোগিন্দির মারা গেছে তারকের সুমুখেই। তারকের মাথায় লাঠি পড়েছিল, কেটে গেছে কপালের উপরে। কারা ধরাধরি করে গামছা দিয়ে কাটা যায়গা বেঁধে এই গাছ তলায় ফেলে রেখেছিল, তদবধি সেই ভাবেই পড়ে আছে, হয়ত জ্ঞান নেই!

রাগ হল মাহিন্দিরের। মেনকার এই অবস্থার জন্য তারকই দায়ী। সে যদি টাকার ওজুহাতে মেনকার বিয়েটা বন্ধ করে না রাখতো তবে হয়ত মাহিন্দির তাকে নিয়ে সময় থাকতে সরে যেতে পারতো। আর বৌ যেতে রাজি হলে মাকেও হয়তো রাজি করা যেতো। খুব হয়েছে বুড়ো তারকের অপকর্মের শাস্তি!

কিন্তু তাতে তো মেনকা উদ্ধার হবে না। মেনকার অবস্থানের পাত্তা পাওয়া যাবে কোথায়?

পরদিন অনেকের সঙ্গে মাহিন্দিরও ধর্মান্তর গ্রহণ করলে। 'ধর্ম' বলতে তার নিজের বেশী কিছু পরিষ্কার ধারণা ছিল না, সুতরাং তা পরিবর্তনেও প্রবল বাধা কি আছে? বিশেষত এমন সময়—যখন ধর্মান্তর না হলেই জন্মান্তর হওয়ার আশু সম্ভাবনা।

ধর্মান্তর গ্রহণে একটা সুবিধা হল। বেশ পরিবর্তন করে অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারল সে, চলে এলো ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে

আর এক গাঁয়ের কাছাকাছি। পথক্লান্তিতে বসলো এসে একটা বটের তলায়। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খাল, বড় নদীতে মিশেছে কিছুদূরে। খালের মুখে একখানা নৌকা বাঁধা।

কোথায় যেন কে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মেয়েলি সুর, গলাটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা। তাকে ধমকাচ্ছে কেউ। কান খাড়া করে শুনলে মাহিন্দির, কথা ও কান্না আসছে নৌকার ছইয়ের ভিতর হতে। কিছুক্ষণ পরে খুব খানিক শাসিয়ে দুইজন জোয়ান লোক নৌকা হতে বেরিয়ে চর ভেঙ্গে রাস্তা ধরে অন্য দিকে গেল।

মাহিন্দির বসে বসে দেখতে লাগলো। নৌকার গলুইয়ের উপর বসে আছে প্রহরী অলস আবেশে খালের জলে পা ঝুলিয়ে, মাঝে মাঝে দেখছে চেয়ে এদিক-ওদিক, তারপর উঠে গেল ছইয়ের মধ্যে। চারিদিক নির্জন।

তক্ষুনি একটা তর্জন শোনা গেল, শোনা গেল ভাঙ্গা গলার কাতরানি। দুলে উঠল নৌকাটা বারে বারে এবং পরক্ষণেই বেরিয়ে এলো লোকটা, কপাল হতে ঝরছে রক্তধারা। গলুইয়ের কাছে এসে সামলাতে না সামলাতে আলু-থালু বেশে বেরিয়ে এলো একটা রাক্ষসী মূর্তি, হাতের ক্ষুরধার অস্ত্রে অস্তসূর্যের রশ্মি ঝিকমিক করে উঠল। মুহূর্তে মাহিন্দিরের চেতনা যেন লোপ পেয়ে গেল। ভৈরবীর হাতের উন্মুক্ত অসি নররক্তে পুনর্বার রঞ্জিত হল। গলুইয়ের উপর লোকটা পড়ে গেল—আর উঠল না।

এবার সেই উন্মাদিনী নারী মূর্তি পথের দিকে ফিরে তাকালো যেখানে গাছতলায় বসেছিল মাহিন্দির। এক দৃষ্টিতে চিনতে পারলে মাহিন্দির। মেনকার সেই ভীষণ মূর্তি সে আগে কখনো দেখেনি। লজ্জানতা হাস্য মধুরা মেনকা, বুকের ভারে যে ঈষৎ ঝুঁকে চলে সে আজ বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পদভরে দুলছে তরণী, তার হাতের অস্ত্র হতে ঝরছে নররক্ত, মাহিন্দিরের চোখের সুমুখে সে অপরাধীকে হত্যা করেছে। বেশবাস অবিন্যস্ত, চুলগুলি ছড়িয়ে পড়েছে পিঠ জঙ্ঘা ছাড়িয়ে উরু অবধি। পিছনের আকাশ লালে

লাল, নদীর ওপারের গ্রামে গৃহদাহ হচ্ছে, তারই লেলিহান শিখা উঠেছে আকাশে, উঠছে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে।

মেনকা—মেনকা—ডাকতে ডাকতে নেমে গেল মাহিন্দির। অনভ্যস্ত লুঙ্গিটা বাধতে লাগল পদে পদে। সেটা হাঁটুর উপর গুটিয়ে তুলে নিয়ে ছুটে গেল নৌকার কাছে।

মেনকা ভীতত্রস্ত চাহনীতে ফিরে তাকালো মাহিন্দিরের দিকে, চিনতে পারল মনে হল না। উত্তত অসি নিয়ে এগিয়ে এলো দুই পা, হেঁকে বললে—খবরদার।

সে হুমকীতে মাহিন্দিরের পিলে পর্যন্ত চমকে গেল, গায়ের কাঁটা উঠল খাড়া হয়ে। অনভ্যস্ত নূতন বেশ শিথিল হয়ে খুলে পড়ল। নিকষ কালো পাথরে খোদাই একটি মূর্তি চরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে মূর্তি দেখে মেনকা হাতের অস্ত্র নৌকার পাটাতনের উপর সশব্দে ফেলে দিলে।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। মাহিন্দির লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকার উপর। তারপর ত্রস্তহাতে লগি তুলে নৌকা খাল থেকে যখন নদীতে এনে ফেললে, দেখে মেনকার জ্ঞান নেই। আকাশের এক কোণ গৃহদাহের আগুনে লাল হয়ে আছে, নদীর জল ও নদী তীরের ঝোপঝাড় ছাপিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। কোন দিকে না তাকিয়ে মাহিন্দির ক্ষিপ্র হাতে বৈঠা চালিয়ে দিলে।

মুখোমুখি

কথাটা মুখে মুখে সারা অফিসে জানাজানি হয়ে গেল—ডেস্‌প্যাচ ক্লার্ক ফণী সেন একখানা উপন্যাস লিখেছে। অফিস-লাইব্রেরিতে সে একখানা বই উপহার দিয়েছে আর তাই নিয়ে টীকা-টিপ্পনী প্রশংসা-বিদ্রূপ ঈর্ষা-আনন্দ চলছেই সহকর্মীদের মধ্যে। আলোচনাটা মুখে মুখে ফিরছিল—শরৎ চাটুজ্জে কেরানী ছিলেন, কেদার বাড়ুয্যে কেরানী ছিলেন, রাজশেখর বসু দীর্ঘদিন অফিসে চাকরি করেছেন। কেরানীদের কলম পেশাই বৃত্তি, সুতরাং সাহিত্য রচনাতেও যখন কলম পেশাই প্রধান তখন কেরানী কথাসাহিত্য রচনা করবে, এ আর এমন আশ্চর্য কী? এই সব আলোচনা।

ফণী এতে একটু গর্বিত বোধ করছিল বইকি। নিন্দা হোক, প্রশংসা হোক, সবাই যে তার বিষয়েই আলোচনা করছে তাতে তো সন্দেহ নেই। সে তাই সহকর্মীদের উপর কেমন এক অনুকম্পা-মিশ্রিত সহৃদয়তা অনুভব করছিল।

দিন দুই পরে ফণীর ডাক পড়ল বোস সাহেবের ঘরে। বোস সাহেব অফিসের ছোট সাহেব। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পরেই তাঁর মর্যাদার সুউচ্চ আসন। বলতে গেলে তিনিই অফিসের প্রধান কর্মসচিব। বড় সাহেবের আর কেরানীকুলের মধ্যে তিনি সেতুবন্ধন করে আছেন। তিনি নিজে বিলাতের বড় ডিগ্রিধারী, আলাপে-ব্যবহারে পুরোদস্তুর সাহেব। তাঁর চেম্বারও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারের মত এয়ার-কণ্ডিশন করা, তাতে চকচকে তামার পাতে তাঁর নাম লেখা। বোস সাহেব থাকেনও সাহেব-পাড়ার মোটা ভাড়ার ফ্লাটে। ঘরে বিলিতি বউ, অফিসে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্টেনো

পামেলা, যার রূপের জৌলুস সারা অপিসের আলোচনার বস্তু। বোস সাহেব বাংলা জানেন কি না কেউ জানে না, কারণ অফিসে তিনি বেয়ারাদের সঙ্গেও বাংলায় কথা বলেন না।

ফণী বোস-সাহেবের চেম্বারে এর আগে দু-চার বার গিয়েছে নিতান্ত কাজের তাগিদে। আজও সে ভিতরে ঢুকে নমস্কার জানাল।

বোস সাহেব পাইপ মুখে দিয়ে একটা ফাইলে চোখ বুলচ্ছিলেন, ফণীকে বোধহয় দেখতে পেলেন না; কিছু সময় পরে ফাইল থেকে চোখ তুলে ফণীকে দেখে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, ইংলণ্ডে-আমেরিকায় ক্রিসমাস গ্রিটিং কার্ড পাঠাবার শেষ তারিখ কবে বলতে পারেন?

সেই নির্ভুল ইংরেজি উচ্চারণ, সেই সংযত শান্ত গম্ভীর মূর্তি। বোস সাহেব কথা বলেন যেন ওজন করে। একটি বাজে কথা নেই, যেটুকু বলা প্রয়োজন ঠিক ততটুকু।

ফণী বেরিয়ে এসে বড়দিনের কার্ড জাহাজী ডাকে ছাড়বার শেষ তাবিখগুলি একটি কাগজে লিখে নিয়ে আবার বোস সাহেবের ঘরে গেল।

কাগজখানি বোস সাহেবের টেবিলে রেখে চলে আসবে এমন সময় বোস সাহেব বললেন, শুনলাম, আপনি একজন লেখক। খুবই আনন্দিত হয়েছি এ কথা শুনে।

ফণী এতখানির জন্য তৈরি ছিল না। কিছুটা বিনয় প্রকাশ করে বলল, সামান্য সামান্য লিখে থাকি। সম্প্রতি একখানা উপন্যাস বেরিয়েছে, আর একখানাও শীঘ্র বেরুবে।

পরের সংবাদটা ফণীর অতি উৎসাহের আস্ফালন, কারণ পরে যে বইটা বেরুবে সেটা তখনও ফণী লেখা শুরু করে নি।

বোস সাহেব বললেন, কি আশ্চর্য, আপনি আমাদেরই মধ্যে রয়েছেন অথচ আমরা আপনাকে জানি না। আপনার বইগুলোর নাম বলবেন, বাজার থেকে কিনে নেব।

ফণীর মুখে সহসা একটা ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল, সে বলেই ফেলল, কিন্তু সে যে আগাগোড়া বাংলায় লেখা, সে কি আপনি পড়তে পারবেন ?

বোস সাহেব বললেন, কেন, বাংলা পড়তে পারব না ভাবছেন কেন ? আমার স্ত্রীও চেষ্টা করে বাংলা শিখে ফেলেছেন।

ফণী বলল, আমার বই কালই আমি নিয়ে আসব। মিসেস বোস বাংলা শিখেছেন, তিনি যদি পড়ে দেখেন তবে আমার লেখা সার্থক হবে।

কথাটা মুখে বললেও মনে মনে ফণী বিদ্রূপের হাসি হাসল। ওরা বড় লোক, বিলাত-ফেরত, 'উঁচকপালে' সমাজের লোক। সাহিত্যপ্রীতি ওদের একটা বিলাস। তবু যখন অফিসের উপরওয়ালা তখন একখানা বই গচ্চা যাবে জেনেও না দিলে ভাল দেখায় না।

আর যদিই বা ঝোঁকের মাথায় সাহেব বইখানা বাড়িতে নিয়ে যায়, ওদের স্বামী স্ত্রী কারও কি সময় আছে এই সব বাংলা বই পড়বার ? ওদের জন্য ক্লাব আছে, পার্টি আছে, সিনেমা আছে, নাচ আছে। নেহাৎ যদি পড়তে কখনও ইচ্ছা যায় তার জন্য আমেরিকান ক্রাইম স্টোরি আছে, সচিত্র সাপ্তাহিক আছে। নিছক সাহিত্যের বই এরা পড়বে কেন, পড়বে কখন ?

পরদিন ফণী তার লেখা একখানি উপন্যাস নিয়ে এল। ভদ্রতার খাতিরে একটি পৃষ্ঠায় বোস সাহেব ও তদীয় পত্নীকে উৎসর্গ-পত্রও লিখে ফেলল। তারপর বইখানা সে নিজেই বোস সাহেবকে দিতে গেল। দূর থেকে সাহেবকে দেখে ফণীর মুখে আবার বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। এঁরাই হলেন বাংলা সাহিত্যের সমঝদার। মুখে বাংলা বলতেও যারা লজ্জা পায় তারা পড়বে বাংলা বই !

বোস সাহেব কিন্তু বইখানির প্যাকেট মুক্ত করে তক্ষুনি হাতে তুলে নিলেন। কী চমৎকার! বাংলা বইয়ের গেট্‌আপ এখন সত্যি কী চমৎকার হয়েছে !

বললেন তিনি বইটির এপিঠ ওপিঠ দেখে। ধন্যবাদ জানালেন তার নিজের ও তাঁর পত্নীর তরফ থেকে।

নমস্কার করে বেরিয়ে আসতে আসতে ফণীর মুখ আবার বিদ্রূপে বাঁকা হয়ে গেল : মলাট সুন্দর হয়েছে দেখেই আনন্দিত। হায় রে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক!

*   *   *

অভিজাত সাহিত্যিক সম্মেলন—'পেন ক্লাবে'র একটি সভা বসেছে আশুতোষ কলেজে। সম্পাদকমশাই উঠে ঘোষণা করলেন, একজন জর্মন কবি এসেছেন কলকাতায়, আজ আমরা তাঁর কাছে জর্মন কবিতার বিষয়ে আলোচনা শুনব। আর সেই সঙ্গে একটি সুসংবাদ আছে। এই বিদেশী কবি যাঁর গৃহে অতিথি হয়েছেন তিনি আমাদের দেশের একজন স্বনামধন্য কর্মী, বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত এবং বাংলাভাষায় রূপধর্মী রম্যরচনার সার্থক শিল্পী 'যাদুকর' ছদ্মনামে খ্যাত ডক্টর অমরেশ বসু। আমাদের পরম সৌভাগ্য, 'যাদুকর' এ সভায় উপস্থিত আছেন এবং তিনিও আজ আমাদের জর্মন রসরচনার বিষয়ে কিছু বলবেন।

ফণী 'পেন ক্লাবের' সদস্য নয়, একজন সদস্যের সঙ্গে এই বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত ছিল। লম্বা সভাগৃহের এক কোণে বসে সে লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল, জর্মন কবির পাশে এসে বসেছেন তার অফিসের কর্তা বোস সাহেব। জর্মন কবির বক্তৃতার সারানুবাদ সরল বাংলায় বুঝিয়ে বললেন তিনিই এবং শেষে তাঁর নিজের বক্তৃতা শুনেও উপস্থিত শ্রোতারা একেবারে নিবিষ্ট হয়ে গেল। এই বক্তা ডক্টর বোসই যে তাদের অফিসের স্বল্পবাক্ কড়া কর্তা বোস সাহেব, ফণী যেন তা বিশ্বাসই করতে পারল না।

সভার শেষে ভিড়ের মধ্য থেকে ফণী পালিয়ে এল। বোস সাহেবের ওই প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে সে আর তাকাতে পারছিল না।

পোষ্টার

একটি বেবি-অফ্‌সেট্‌ মেসিন তোলা হয়েছে। সামনে পূজোর মরসুম, ছাপাখানায় কাজের এমনিতেই খুব চাপ, তার উপর এই সময়েই এই নতুন মেসিনটা কেনায় গোটা প্রতিষ্ঠানে যেন একটা প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। লেটার প্রেসে যারা কাজ করে—লাইনো, মনো প্রভৃতি টাইপ সেটিং-এর মেসিন তাদের কাছে বিস্ময়কর হলেও চেনাজানার মধ্যেই। কিন্তু 'অফসেট' একেবারে আলাদা জাতের মেসিন। তেলে-জলে মিশ খায় না, বিজ্ঞানের এই সহজ কথাটার যান্ত্রিক ব্যবহার কি অপরূপ মুদ্রণ ব্যবস্থায় রূপায়িত হচ্ছে—চোখের সম্মুখে দেখলেও যেন বিশ্বাস হয় না।

মিঃ বিশ্বাস সব অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসের কোঠায় সরিয়ে আনেন। সামান্য কম্পোজিটার থেকে আজ এতো বড় 'প্রতিভা প্রেস'-এর মালিক তিনি। প্রতিভা যে আছে তাঁর তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, প্রতিভার চেয়েও তাঁর বেশি আছে পরিশ্রম। প্রেসের কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও খাটছেন, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা সমানে উপর-নীচে ছুটাছুটি করছেন। কম্পোজিং রুমে এতোটুকু ময়লা নেই, মেসিন রুমে কোথাও ছেঁড়া কাগজটুকু পড়ে থাকে না, কাটিং মেসিনের কাজ শেষ তো তার পাশও পরিস্কার। সারা প্রেসটি পরিচ্ছন্ন,—ঝকঝকে ছাপা বুঝি এমন পরিবেশেই পরিস্ফুট হয়।

রমেন এখানে কাজ করতে এসে খুশিই হয়েছিল। মাইনে সে বেশি পায় না, কিন্তু কাজটি তার ভালো লাগে। এ অফিসের আবহাওয়াতেই কেমন একটা সহজাত কর্মনিষ্ঠা জাগায়। অফিসটি বৃহৎ কিছু নয়। একটি নাতি বৃহৎ হল ঘর, পাশাপাশি

তিনটি চেম্বার—মিঃ বিশ্বাসের, ম্যানেজার পরিতোষ রায়ের এবং আর্টিস্ট বিমল ঠাকুর আর কমল ঘোষের। বাইরে ক্যাস, একাউণ্টস পিছন দিকটায়, সুমুখেই 'এনকোয়ারি', তার পিছনে টেলিফোন একস্‌চেঞ্জ আর ডেস্‌প্যাচ এক টেবিলে, তার পিছনে তিনটা টেবিল পর পর প্রুফ-রীডারদের জন্য। প্রতিটি প্রুফ পুনঃ পুনঃ দেখবার নিয়ম এখানে, নির্ভুল ছাপাও তাই প্রতিভা প্রেস-এর একটি বৈশিষ্ট্য। ছয়খানি পাখা দুই সারিতে ঝুলছে। তারই মধ্যে তিনটি বড়ো কাচের ডোমে উজ্জ্বল আলো। এ বাদে প্রুফ রীডারদের টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প। টেবিলগুলি একমাপের, চেয়ারগুলি এক ধাঁচের। আলমারিগুলি সব একই নক্‌সার। সব আসবাবই প্রতি বছর পূজার ছুটির মধ্যে পালিশ করা হয়, তাই কোথাও এতটুকু বিবর্ণতার ছোপ নেই। পিতলের পেপার-ওয়েটগুলি, কলিং বেলটি সবই মাজা, ঝক ঝক করছে। এমন টেবিলে বসেও আনন্দ হয়। হাতের কাছে দরকারি সব অভিধান, কাজ করতে বসে উঠে যাওয়ার দরকার নেই। কলিং বেল বাজালেই বেয়ারা পঞ্চু এসে প্রুফ নিয়ে যাবে।

গত দু বছর রমেন আসে যায়, নিজের কাজ করে, নিরিবিলিতে নিজের কাজটি নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেই সে ভালবাসে। কিন্তু আজ সেও উঠে এল মেসিন রুমে। বেবি-অফসেটে তেলে জলে ছাপা চলছে এ ব্যাপারটা সেও একটু উঁকি দিয়ে দেখতে চায়।

ছোট একটি পোস্টার ছাপা হচ্ছে মেসিনে, সিনেমার পোস্টার। নতুন বাংলা বই তোলা হচ্ছে—নায়িকা এ যুগের সেরা চিত্র-তারকা চিত্রা চট্টোপাধ্যায়। একখানা পোস্টার লুকিয়ে নিয়ে এলে হত, কিন্তু কেমন লজ্জা করল রমেনের। মেসিন ঘরের ছোকরারা ছবি নিয়ে যায়, দরোয়ান ভগৎ সিং তাই নিয়ে একবার বড়োবাবুর কাছে পর্যন্ত নালিশ জানিয়েছে। তা-ছাড়া মেসিনম্যান বুড়ো আসমৎ মিঞার কাছে গিয়ে একটা পোস্টার চাইতেও রমেন লজ্জা পেল। এই সময় মিঃ বিশ্বাস মেসিন রুমে এসে পড়ায় রমেন পালিয়ে এলো

নিজের টেবিলে, গ্যালি প্রুফের লম্বা কাগজ বিছিয়ে একবার-কাটা প্রুফে আবার চোখ বোলাতে বসল।

কিন্তু আজ আর কাজে মন বসল না তার। চিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধত চাহনি আঁকা পোস্টারটা তার চোখের সুমুখে ভাসতে লাগল। সে এখানে দোতলার কোণের ঘরটিতে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে প্রুফ দেখছে, আর এই বাড়িই নীচের তলায় বেবি অফসেটে জলের স্রোতের মতো কাগজের স্রোত বয়ে চলেছে, তাতে ছাপা হচ্ছে চিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ছবি—'ছায়া নয়, ছবি নয়।'

চিত্রা চট্টোপাধ্যায়। তিন বছর আগে রমেনের বন্ধুপত্নী চিত্রাকে বাইরের কে চিনত? আজ সে সবার প্রিয় চিত্র তারকা। কলকাতার সাতখানা ছবিতে কাজ হচ্ছে। তারই ফাঁকে উড়ে গিয়ে বোম্বাই-এর একটা বাংলা ছবিতে নেমে আসছে, আবার মাদ্রাজের সবার চেয়ে বড়ো চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও নাকি ইতিমধ্যে কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেছে—তাদের পরবর্তী হিন্দি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় নামবে চিত্রা। শুনে রমেনের আনন্দ হয়, চিত্রার জন্য গর্ব বোধ করে, কিন্তু কখনও দেখা করতে যায় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এলো রমেনের বুক চিরে। হল ঘরের বাইরে একটি চতুষ্কোণ বারান্দা, তার ওপাশে কাচের দরজা দিয়ে 'ওয়ার্কশপ, নো অ্যাডমিশন' লেখা অংশ। ছোট বারান্দাটুকু খুব সাজানোগোছানো। গোল নীচু টেবিলের উপর কয়েকখানি পত্রিকা, পাশে কয়েকটি কৌচ। একখানি 'সিলিং ফ্যান।' দেওয়ালে কাচের দেওয়াল আলমারিতে এই প্রেসে ছাপা জিনিষের নানা নমুনা। শো-কেসের মধ্যে ফ্লুরোসেণ্ট টিউব জ্বলছে। দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে একখানা বাঁধানো পোস্টার ঝুলছে, রমেনের টেবিল থেকে সোজা তাকালেই চোখে পড়ে। ওই পোস্টারখানাও এই প্রেসে ছাপা। স্টোন লিথোর কাজ, কিন্তু খুব যত্ন করে ছাপা। মিঃ বিশ্বাসের একটি ভালো কাজের নিদর্শন হিসাবেই যে শুধু এই পোস্টারটি এখানে বাঁধানো আছে তাই নয়, পোস্টার লাইনেই এই তাঁর প্রথম কাজ। কাজটি এতো ভালো উৎরে ছিল যে তিনি মুদ্রণ

প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবং সেই থেকে সিনেমার পোস্টার ছাপার কাজ তাঁর এতো বেড়ে গেছে যে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছে। বেবি অফসেট একটি এসেছে, আর একটি বড়ো অফ্‌সেট মেসিন জার্মানিতে অর্ডার দিয়ে এসেছেন মিঃ বিশ্বাস। সেটি এসে পড়লে এই বিভাগটি লেটার প্রেস বিভাগ ছাড়িয়ে যাবে। আর মিঃ বিশ্বাসের ছেলে রয়েছে জার্মানিতে। গ্রেভিওর প্রিন্টিং শিখছে সে। সে আসবার পর ফোটো গ্রেভিওর প্রিন্টিং-ও সুরু করবার ইচ্ছা আছে মিঃ বিশ্বাসের। বলতে গেলে প্রতিভা প্রেস-এর ভোলই পালটে গেল দেখতে দেখতে। মিঃ বিশ্বাস-এর বিশ্বাস, আর দশটি বছর যদি তিনি বাঁচেন,—তাঁর কর্মচারীদের বিশ্বাস তিনি তিন দশে তিরিশ বছরও বাঁচবেন আরো এমনি অটুট তাঁর স্বাস্থ্য,—তবে তিনি প্রতিভা প্রেসকে বাংলার মুদ্রণপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রতীক তৈরী করে যাবেন। কিন্তু এ সবই হয়েছে খুব সামান্য দিন। মিঃ বিশ্বাস একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেই ফেলেছিলেন—ঐ পোস্টারটি আমার ঘরের লক্ষ্মী'। ওটি ছাপা ইস্তক সিনেমা জগতে ওঁর খুব প্রতিপত্তি হয়েছে, প্রযোজক পরিচালক এমনকি চিত্র তারকারাও তাঁর কাছে পোস্টার ছাপবার পক্ষপাতী। এই চিত্রা চট্টোপাধ্যায়ই কি কম প্রশংসা করেছেন? একদিন 'আজকাল চিত্র প্রতিষ্ঠান'-এর অফিসে সাক্ষাত হলে তিনি তো মিঃ বিশ্বাসের ছাপা পোস্টার এক কপি চেয়েই বসলেন!

আর ওই যে আর্টিস্টদের জন্য পৃথক চেম্বার একেবারে ম্যানেজার পরিতোষ বাবুর ঘরের পাশেই, ওটাও হল ওই পোস্টারটার জন্যই। কি কমলবাবু, কি বিমলবাবু, কেউই আশা করেন নি ছবিটা এমন ওৎরাবে। শুধু ওদের হাতের ছবিই নয়—গোটা চলচ্চিত্রটাও 'হিট' হল কিনা। তাইতো পোস্টারটাও ছাপা হল সাত সাত বার। কমলবাবু আগেও বহু 'ফিগার' এঁকেছেন, বিমলবাবুর ঐ প্রাচীন বাংলা হরফের ধরনের 'টাইপ' লেখাও আজকাল খুব নকল হচ্ছে। তবু এই পোস্টারটার যোগাযোগ যেন আকস্মিক। পাতলা 'নাইলন'

শাড়ীর আবরণ ভেদ করে নায়িকার সুপুষ্ট দেহাবয়বের প্রতিটি সুক্ষ্ম রেখা স্পষ্ট চোখে পড়ে। তার মুখে চোখে যে অপরূপ ভাবব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে, মূল চিত্রেও তা নেই। আর নীচে থেকে উঠেছে লেলিহান অগ্নিশিখা। 'সতীদাহ'! রমেন চোখ নামিয়ে নিলে। তার টেবিলের কাছে আলো ঝলকাচ্ছে, ঘূর্ণায়মান পাখার ছায়া পড়েছে, সেখানেও সে যেন লেলিহান অগ্নির কম্পমান শিখা দেখতে পেল। ভয়ে চোখ বন্ধ করলে রমেন।

'সতীদাহ'। রমেনের লেখা একটি ছোট গল্প। ভিন্ন নামে এই গল্পটিই নামকরা সাপ্তাহিক 'দেশ-বিদেশ'-এর একটি সাধারণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কে পড়েছে না পড়েছে কে জানে, কিন্তু রমেন দু তিনবার পড়েছিল। নিজের লেখা ছাপা হওয়ার পর সবাই পড়ে দেখে, বিশেষ করে যাদের লেখা কালেভদ্রে ছাপা হয়। রমেন লিখতে পারত কিন্তু লেখা প্রকাশের সুযোগ পেত না। আর লিখলেই তো কেউ এমন টাকা দেয় না যাতে লেখক হিসাবেই বাঁচা চলে। তাই তাকে কোন সময় ইস্কুল মাস্টারি, কোন সময় স্কুলের বই-এর নোট লেখা, কোন সময় অপরের নামে ইংরাজি বই-এর অনুবাদ এইসব করতে হত। এমনি সময় অতি আকস্মিক ভাবে সে একটি প্রস্তাব পেল। তার লেখা 'সতীদাহ' গল্পটিতে প্রাচীন বাংলার সমাজচিত্র সে আংশিকভাবে এঁকেছিল, দেখিয়েছিল সেই যুগ, সেই কাল, সেই ভয়াবহ কুসংস্কার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও অর্দ্ধশিক্ষার বীভৎস উলঙ্গ রূপ। গল্পটির মধ্যে যে একটা প্রবল নাটকীয় উন্মাদনা আছে তা সে লিখতে লিখতেই অনুভব করেছিল, অনুভব করেছিল গল্পের নায়িকার মর্মান্তিক অসহায়তা, অন্ধ কুসংস্কারের বলি হয়ে গেল একটি মহান জীবন। প্রস্তাব এল এই গল্পটিকে একটু কমিয়ে বাড়িয়ে আংশিক পরিবর্জন পরিবর্ধন এবং সংস্কারসাধন করে চিত্রের উপযোগী করে দিতে। ইতিহাসের ছাত্র রমেন অনেক পরিশ্রম করে স্ক্রিপ্ট তৈরী করলে, সেই বিগত কালের পটভূমিকায় রচিত হল এক মর্মবিদারক মহান চিত্র।

প্রযোজক গল্প শুনে খুশি হলেন, পাণ্ডুলিপি রেখে দিলেন নিজে আবার পড়বেন এবং পরিচালককে পড়াবেন বলে। রমেন এক সপ্তাহ পরে দেখা করতে গেলে তার কী আদর যত্ন। রমেন অভিভূত হয়ে গেল। তার স্ত্রী তখন অসুস্থ। তুই রাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি রমেন, স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে বসে কাটিয়েছে। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। বাঁধা মাইনের কোন চাকরিও নেই। বিশ্ববন্ধু গ্রন্থাগারের জন্য একখানা চটকদার গোয়েন্দা কাহিনী অনুবাদ সুরু করেছিল, তার বাবদ পঁচিশ টাকা অগ্রিম এনেছে, আর সেখানে টাকা পাওয়া যাবে না, চাইলেও দেবে না তারা। অথচ সে তুদিন স্ত্রীর কাছে বসে, রান্নাবান্না হচ্ছে না, ছেলেমেয়েকে এনে দিয়েছে চিড়েমুড়ি, নিজেও একমুঠি চিবিয়ে জল খেয়েছে। আজ তুটো ভাতও রান্না করা দরকার, আর স্ত্রীর ওষুধপত্র, ডাক্তারের ফি, তার জন্যও টাকা চাই কিছু। অগত্যা তাই প্রযোজক পরিমল রায়ের কাছেই এসেছে। পরিমল বাবু যদি কিছু টাকা দেন বড়ই উপকার হয়।

পরিমলবাবু যেভাবে আদরযত্ন করলেন তাতে টাকার কথা বলতে রমেনের লজ্জা হতে লাগল। কিন্তু না বললেও চলবে না। সে তাই গল্পটার কি হল জানতে চাইলে। পরিমলবাবু বললেন—গল্পটা একবার পড়ে দেখতে হবে আবার, তা যা করে হোক চালিয়ে দেওয়া যাবে। রমেন তখন সবিনয়ে তার বক্তব্য পেশ করলে। পরিমল বাবু তখনি ভিতরে উঠে গেলেন, নিয়ে এলেন পাঁচখানা করকরে একশো টাকার নোট, এনে টেবিলের সোনালী সিংহটা চাপা দিয়ে রাখলেন। টেবিলের দেরাজ টেনে বের করলেন একখানি নীলাভ কাগজ, বল্লেন—এটা পড়ে দেখে সই করে দিন, টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

কাগজখানা পড়তে পড়তে পৃথিবীটা ঘুরতে লাগল রমেনের চোখের সমুখে, তুলতে লাগল চেয়ার-টেবিল-ঘরবাড়ি। চোখের সমুখে পরিমল রায়ের মুখটা ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল রোগপাণ্ডুর স্ত্রী সবিতার করুণ মুখখানি। সবিতাকে সে ছোটবেলা

থেকে ভালবাসত, বড়ো হয়ে তাকে পড়িয়েছে, বিয়ে হওয়ার পরও কোনদিন তাকে ছেড়ে থাকে নি। সেই সবিতা আজ একমাসের উপর শয্যাশায়ী। মনে এলো আর দুটি কচি মুখ—কানু আর পিনু, তার ছেলে আর মেয়ে। আসবার সময়ও বলে দিয়েছে—লজেন্স এনো বাবা। চাল নেওয়ারও পয়সা নেই রমেনের। সবিতার ওষুধ চাই, কানু-পিনুর লজেন্স চাই। চোখে সব যেন ঝাপসা হয়ে গেল। নীলাভ কাগজখানা হাতের মুঠোয় থর থর করে কাঁপতে লাগল। শুষ্ক গলায় শুধু বল্লে—আমার নামটা কোথাও থাকবে না?

পরিমলবাবু একটা গোল্ড্ ফ্লেক সিগারেট ধরালেন—আর একটা তার সোনার সিগারেট কেস থেকে এগিয়ে দিলেন রমেনের দিকে, বল্লেন—দেখুন, আপনারা লেখক মানুষ, কাগজ কলম নিয়ে বসলেই অমন কত সতীকে দাহ করতে পারেন, আপনারাও নামের কাঙ্গাল? আর ধরুন এই যে পাঁচশ টাকা, এ তো পাচ্ছেন একটা ছোট গল্পের জন্যই। বাংলাদেশে কেউ কখনো পেয়েছে? দশ-পনেরো-বিশ-পঁচিশ উর্ধ্বে পঞ্চাশ টাকা, তার একপয়সা বেশি কেউ দেয় না। ওই যে 'দেশ-বিদেশ' কাগজখানায় গল্পটা বেরিয়েছিল—কত পেয়েছিলেন? আর ছবিটা তুলতেও তো লাখ-দুলাখ খরচ আছে। ছবিটা যদি ওৎরায়, আপনাকে দেব আরো কিছু। কিন্তু এসব কেবল ওই একটি সর্তে—গল্পটা আমার নামেই যাবে। আর এ কথাও বলতে হচ্ছে নেহাৎ প্রাণের দায়ে ভাই, গিন্নীর তাগিদে—বলে কিনা আমি শুধু টাকাই ওড়াই, কোন গল্পতো তৈরী করতে পারিনে। আর আপনি যদি নেহাৎ অসম্মত হন, এই যে আরো 'স্ক্রিপ্ট্' আমার কাছে এসেছে, এর যে কোন একটা কিনব।—বলে পরিমলবাবু আর একটা দেরাজ টেনে দু-তিনটা মোটা খাম বের করে টেবিলের উপর রাখলেন।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে নয়টা বাজল। রমেন চমকে উঠল। সবিতার স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেক্সান দেওয়ার সময় দশটায়, আর

দেরি করলে আজ হয়তো ডাক্তারকে পাওয়া যাবে না, সময় মতো ইনজেক্‌সনও দেওয়া হবেনা। রমেন আর ইতস্তত না করে কাগজটায় সই করে দিলে। রেভিনিউ স্ট্যাম্পের অশোকস্তম্ভের সিংহগুলিও বুঝি সে স্বাক্ষরে শিউরে উঠল।

'সতীদাহ'। রাজপথের দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়ল। চিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ চিত্রাবতরণ, নায়িকার ভূমিকায় এই প্রথম, এবং চরম চরিতার্থতার পরিচয় দিলে সে সতী-র ভূমিকাটিতে। চিত্রার তারকাজীবনে মোড় ঘুরে গেল। আর তাকে পার্শ্বচরিত্রে নামবার নির্যাতন ভুগতে হয়নি। বাংলা-বোম্বাই-মাদ্রাজ যেখানেই যাক—সে নায়িকা। পরিমল রায়ের 'আজকাল চিত্র-প্রতিষ্ঠানে' চিত্রা মোটা মাইনের শিল্পী। টালিগঞ্জে বাড়ি, স্টুডিবেকার গাড়ি, চিত্রার কী না হয়েচে!

আর পরিমল রায়? এখন বাংলাদেশের সেরা চিত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তার কোম্পানিও একটি। একটি দুটি নয়, পর পর সাতটি ছবি তুলে তার মধ্যে ছ'টি 'হিট' পিক্‌চার হয়েচে। সব ছবিতে চিত্রাই নায়িকা।

পরিমল রায়ের নামে 'সতীদাহ' উপন্যাস-ও বেরিয়েছে। এই তিন বছরে কয়েকটি সংস্করণ ছাপা হয়ে বইটা বাংলা সাহিত্যেও একটা আসন লাভ করেছে। পরিমলবাবু এখন সময়াভাবে আর বেশী লেখেন না, কচিৎ 'স্মৃতিকথা' কি ছোট গল্প লেখেন, তাও লোকে লুফে নেয়।

ছবি উৎরে গেলে আরো কিছু টাকা দেবেন বলেছিলেন পরিমল বাবু। রমেন তা আর আনতে যায়নি। পরিমলবাবু তা নিয়ে আর মাথা ঘামান নি। আকস্মিকভাবে একদিন এক বন্ধুর বাড়িতে দেখা হয়ে গেল। পরিমলবাবু একটু গায়ে পড়েই রমেনকে নিজের গাড়িতে করে তুলে নিয়ে এলেন। পথে শুনলেন—তার চাকরি নেই, এটা ওটা লিখেই তাকে চালাতে হচ্ছে। পরিমলবাবু সম্প্রতি প্রতিভা প্রেসের পার্টনার হয়েছেন। দু-লাখ টাকা নগদ দিয়েছেন। সুতরাং

সেখানেও তাঁর কথার মূল্য আছে বৈকি। রমেনকে তিনি নিয়ে এলেন প্রতিভা প্রেসে। মিঃ বিশ্বাসকে বল্লেন—'ভালো প্রুফ রীডার খুঁজছিলেন, তাই ধরে নিয়ে এলাম।' সেই অবধি রমেন এখানে আছে।

আর এখানে এসে সে জানতে পেরেছে—তার 'সতীদাহ' ছবির পোষ্টার ছেপে এদের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠেছে।

সংসারে এক একটা ব্যাপারে এমনই ঘটে বুঝি। সবার মূলে যে সেই হয় সব চেয়ে বঞ্চিত। রমণীয় প্রাসাদের ভিত্তিতল চিরচিনের জন্যই লোকলোচনের বাইরে থেকে যায়। বাইরের কেউ না জানুক রমেন মনে মনে এই ভেবে তৃপ্তি পেত যে তার রচনা সার্থক হয়েচে, সেই রচনার উপর দাঁড়িয়েছে পরিমল রায়, 'আজকাল চিত্র-প্রতিষ্ঠান', চিত্রা চট্টোপাধ্যায়, চিত্রার 'প্লে-ব্যাক' গায়িকা কুমারী রাত্রি মিত্র, হয়ত আরো কতজন—পরিচালক, পরিবেশক প্রভৃতি। আর দাঁড়িয়েছে এই প্রতিভা প্রেস, যেখানে সেও এসে আশ্রয় পেয়েছে এতদিন পরে একটা বাঁধা মাসোহারায়। এখানে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে যখন সে মুখ তুলে বাইরে বারান্দায় তাকায়, চোখে পড়ে ফ্লুরোসেণ্ট আলোর তলায় বাঁধানো 'সতীদাহ' পোস্টারখানা, তখন সবদিন কিছু মনেও আসে না—নিত্যদর্শনে ও পোস্টারটা যেন আর কোন বিশেষ অর্থ বহন করত না।

দিন হয়ত এই ভাবেই কাটত, কিন্তু তা হ'লনা। একদিন চিত্রা চট্টোপাধ্যায় এলেন পরিমলবাবুর সঙ্গে। অফিসে একটা তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। তাঁরা দুজনে মিঃ বিশ্বাসের ঘরে গিয়ে বসলেন। ম্যানেজার পরিতোষ রায় ছুটাছুটি করতে লাগলেন, মিঃ বিশ্বাস ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। রমেন চিত্রাকে এ বেশে চাক্ষুস আর কোন দিন দেখেনি। আজ দেখে লজ্জায় ঘৃণায় সে যেন মাটিতে মিশে গেল। চিত্রার সঙ্গে তার পরিচয় আছে সে কথা এখানে আর কেউ জানে না। চিত্রা আর পরিমল রায়ের সম্বন্ধ নিয়ে নানা কানাঘুষা চলে সত্য, কিন্তু তাই বলে একটা ছাপাখানায়

ওরকম সাজসজ্জায় সেই বা এলো কি করে, পরিমলবাবুই বা নিয়ে এলেন কেমন করে? তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। প্রেসের লোকেরা, আপিসের কেরাণীরা সবাই চলে গিয়েছে, শুধু নাইটসিফট্-এ সেই বেবি-অফ্‌সেট মেসিনে 'ছায়া নয়, ছবি নয়' চিত্রের জরুরি পোষ্টার ছাপা হচ্ছে। নায়িকা চিত্রাকে নতুন মেসিন দেখাবার উপলক্ষ্য করে প্রেসে আনা হয়েছে। হাতে জরুরি প্রুফ থাকায় রমেন কাজ করছিল, নতুবা তারও এসময় থাকবার কথা নয়।

চিত্রাকে হয়তো স্টুডিও থেকেই নিয়ে এসেছেন পরিমলবাবু। সঙ্গে আর কেউ নেই। মিঃ বিশ্বাস নিজে তাদের নিয়ে গেলেন মেসিন রুমে, তারপর আবার উপরে তুলে নিয়ে এলেন। ভোজ্য এলো, বহুমূল্য পানীয় এলো, বাইরে বসে রমেন মনে মনে ঘেমে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তারা বেরুলেন। এবার পরিমলবাবু চিত্রার অনাবৃত কোমর জড়িয়ে ধরে নীচে নেমে গেলেন, তার টেবিলের পাশ দিয়েই গেলেন, কিন্তু নগণ্য প্রুফ রীডারকে কেউ লক্ষ্যই করলে না। ম্যানেজার আর মিঃ বিশ্বাসও অতিথিদের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গেলেন।

বাইরে বারান্দায় চোখ পড়তেই ফ্লুরোসেণ্ট আলোর নীচে কাচের তলায় 'সতীদাহ' পোস্টারখানা রমেনের নজরে পড়ল, সে সতীর চোখে ত্রাসের চিহ্ন, নীচে লেলিহান শিখা এঁকেবেঁকে উঠেচে। আর আজ? আজ চিত্রার চোখে মদির-জড়িমা, অসংবৃত বেশবাস, পরিমল রায়ের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। রমেনের মনে হল—ও সিঁড়িটা নেমেছে বুঝি রসাতলের দিকে।

রক্তে আগুন ধরে গেল নিরীহ প্রুফ রীডার রমেনের। ছুটে গিয়ে কাচের তলা থেকে একটানে বের করে আনলে সেই পোস্টারখানা, তারপর ফাঁস করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

পুঁথি

সাহিত্য পরিষদের পুঁথিসংগ্রহশালায় বসে কাজ করছিলাম, এমন সময় টেলিফোনে ডাক এলো। টেলিফোন ধরে কথাবার্তা সেরে ফিরে আসবার মুখে দেখি অমিয় লাইব্রেরীর সুমুখে দাঁড়িয়ে কি বই নিচ্ছে। ওর নাম আপনারা জানেন, দেশবিখ্যাত শিল্পী, ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রশিল্পে সে বিশেষ নাম করেচে, এখন আবার লোকশিল্পের সন্ধানে ঝুঁকেছে।

অমিয়কে ডাকলাম, বললাম, লোকশিল্পের সন্ধান চাওতো চলো পুঁথিশালায়। পুঁথির পাটা, পট, পাতায় পাতায় কত বিচিত্র শিল্প নিদর্শন। ওর হরফেই বা কত কারিকুরি! আর যদি ছবির বিষয়বস্তু চাও তাও অঢেল মিলবে ওর কাহিনীগুলিতে। বেহুলা, চাঁদ সওদাগর,—আঁকো না এদের ছবি।

অমিয় হাসলে, বললে, আর যা বলবেন রাজি আছি, কিন্তু পুঁথি-পাণ্ডুলিপিতে আমার কোন দরকার নেই। অযত্নে নষ্ট হোক, অবহেলিত হোক—আমি তার জন্য আবার জীবন বিপন্ন করতে চাইনে।

অমিয়ের কথায় যেন কোন পুরোনো ঘটনার রেশ ভেসে এলো। বললাম—পুঁথির যদি যত্ন না করো তবে অচিরে এসবই যে নষ্ট হয়ে যাবে।

যায় যাক, ও যাওয়াই ভালো।

বলো কি পাগলের মতো, এ কি শিল্পীজনোচিত কথা হল? পুঁথিতে কত অমূল্য জিনিষ আছে জানো?

জানি। আর পুঁথি রক্ষা করতে গিয়ে কি ভাবে লোকে জীবন দেয় তাও জানি। তবে শুনুন একটা ঘটনা।

অমিয় বলতে সুরু করলে—

বসন্ত রায়ের বাড়ীতে আমাদের গ্রামের পাঠশালা বসতো, ছোটবেলায় সেখানেই আমি পড়েছি। ধনী গৃহস্থের বাড়ীর যেমন ব্যবস্থা থাকে সবই তেমন ছিল। রাস্তা থেকে সুরু খুব বড়ো একটা উঠান, উঠানের শেষ প্রান্তে দক্ষিণদুয়ারী লম্বা দালান। পূবে মণ্ডপ, পশ্চিমে গোয়ালঘর। বাড়ীর ভিতরে আর একটা উঠান। তার পূবে রান্নাঘর, পশ্চিমে ভাঁড়ার ঘর। উত্তরে চাকর-বাকরদের থাকবার ঘর আর ধানের মরাই। মণ্ডপের পিছনে পুকুর, পুকুর পাড়ে নারকেল সুপারির বাগান।

পাঠশালা বসতো সেই মণ্ডপ ঘরে। আমি যখন পাঠশালায় গেছি তখন ও বাড়ীর শ্রীসম্পদ সব লোপ পেয়েছে। মণ্ডপ ঘরের বড় বড় দরজা হা হা করছে, একখানাও কপাট নেই। জানালার শিক ভাঙা, পাল্লা বাঁকা হয়ে ঝুলছে। পশ্চিমের গোয়ালঘরের চিহ্ন মাত্র নেই—শুধু মাটির ঢিবি উঁচু হয়ে আছে। পুকুর শ্যাওলাদামে ছাওয়া, ঘাটের কাছে কাটা ছোট্ট ফুটে কাকচক্ষু জল টলমল করে তবু।

আর ওই টানা লম্বা দালানটার সবগুলো দরজা-জানালা বন্ধ, সুমুখের দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে। উঠান ছেয়ে গেছে আগাছায়, থাম জড়িয়ে উঠেছে অচেনা লতা। পোড়োবাড়ি, সাপ শেয়াল-এর বাসা, দিনের বেলাও মানুষ ঘেঁষে না ওদিকে। আর ছাদের উপর চলে এসেছে একটা চালতা গাছের ডাল। ছোড়দার কাছে শুনেছি, ফুটবল খেলে ফিরবার মুখে সে নিজে দেখেছিল এক ব্রহ্মদৈত্যকে খড়ম পরে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে ওই ছাদের-উপর-চলে-আসা চালতা গাছের ডালে। ওদিকে একটা আতা গাছে বিস্তর আতা হয়, পাকা আতা কাকে ঠুকরে ঠুকরে খায়; দেখি, লোভ হয়, কিন্তু ভয়ে ওদিকে যাই না। কি জানি, চালতা তলায় গেলে যদি একখানা লম্বা হাত নেমে এসে গ্যাঁক করে ঘাড়টা মটকে দেয়। কথাটা গোপনে বলাবলি করেছি সহপাঠী শচীনের সঙ্গে। ছোড়দাকে আমরা সবাই খুব ভালবাসি, তার কথা কি মিথ্যে হয়।

ভয়ে ভয়ে দেখি ওই পোড়ো বাড়িখানা। বাড়ির মালিক বসন্ত রায় অনেকদিন মারা গেছেন। শুনেছি তাঁর ছেলেরা কৃতী, কলকাতায় বাড়ি গাড়িও আছে, তাই হয়ত দেশের এই সামান্য সম্পত্তির খোঁজ খবর নেন না। পড়ে আছে তো পড়েই আছে। এমন আরো দু'চার ঘর গ্রামে আছেন—তাঁরা পূজায় বাড়ি আসেন, একসপ্তা-দশদিন থাকেন, আবার চলে যান। কিন্তু এ-বাড়ির কেউ কোনদিন আসে না, মণ্ডপে পূজাও আর হয় না। সারা বছর আমরা পাঠশালায় পড়ি। সরস্বতী পুজা হয়, মূর্তিগুলি জলে না ফেলে দিয়ে পণ্ডিত মশাই ঘরের 'আড়া'-য় বেঁধে বসিয়ে রাখেন। তাঁরা বছরের পর বছর জমছেন, আর সারা বছর ধরে ছাত্রদের বিদ্যাদান করছেন।

পাঠশালা 'পাশ' করে 'বড়' ইস্কুলে গেলাম। যখন দশম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমাদের সঙ্গে পড়তে এলো অহিভূষণ রায় নামে একটি ছেলে—শুনলাম সে বসন্ত রায়ের নাতি। ছোটবেলা থেকে শহরে মানুষ, গ্রামে কোনদিন আসেনি, গ্রামের কোন কিছু জানে না। তাকে ভারী ভালো লাগল আমার। দু'দিনেই ভাব হয়ে গেল।

অহিভূষণ থাকত এ পাড়ার আর একটি বাড়িতে, বড় ইস্কুলের কাছে। ওই পোড়ো বাড়িতে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া তার আরো গভীর কারণ ছিল।

কথাটা অহি কেবল আমাকেই বলেছিল।

বসন্ত রায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, নিজেই কেবল লেখাপড়া করতেন তাই নয়, যাতে বিদ্যার চর্চা প্রসারিত হয় তাতেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। নিজের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসিয়েছিলেন, চিরকাল পাঠশালার পণ্ডিতের বেতন নিজেই দিতেন। এসব তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার প্রমাণ।

কিন্তু তিনি এছাড়া আরো বড়ো কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। গ্রামে গ্রামে হাতে লেখা যে সব পুঁথি ছড়িয়ে ছিল তিনি তাই সংগ্রহে মন দেন। অনেক পুঁথি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল

সেগুলি ছাপিয়ে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করবেন এবং সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে জাতিকে উপহার দেবেন।

কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হল না। তিনি আকস্মিকভাবে মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুটাও পুঁথিসংক্রান্ত বিভ্রাটে ঘটেছিল বলা চলে।

ভিন্ন গ্রামের এক ওঝার বাড়ি ছিল মনসামঙ্গলের হাতে লেখা পুঁথি। তিনি টাকার জোরে সেই পুঁথি সংগ্রহ করেন। অনেক পরিবারেই এই সব পুঁথি পারিবারিক সম্পদ হিসেব রক্ষিত হত। জীবনের বিনিময়েও তারা এসব পুঁথি হাতছাড়া করতে চাইত না। এই কুসংস্কারের জন্যই যে অনেক মূল্যবান পুঁথি ছাপা হয়নি এবং কালে হয় আগুনে পুড়েছে, নয় উই-ইঁদুরে খেয়েছে, না হয় হারিয়ে গেছে—একথা অনেকেই জানেন। বসন্ত রায়ও চেয়েছিলেন পুঁথিগুলি বাঁচাতে, তাই উপযুক্ত দাম দিয়েও না পেলে 'ছলে বলে অথবা কৌশলে' তিনি কার্যোদ্ধার করতে পশ্চাদ্‌পদ হতেন না।

এক্ষেত্রে ফল কিন্তু উল্টা হল। 'ওঝা' যখন জানলে, তার পারিবারিক পুঁথি অর্থবলে বসন্ত রায় হস্তগত করেছেন, তখন সে সাপ চালান দিলে। মন্ত্রপূত সেই সাপ গ্রাম গ্রামান্তর পেরিয়ে বসন্ত রায়ের বাড়ি এসে তাঁর কুক্রিয়ার প্রতিশোধ নিয়ে গেল। সর্পাঘাতে মারা গেলেন বসন্ত রায়। তিনি মারা গেলেন, কিন্তু সেই পুঁথি, তাও কি ফেরত গেছে? লোকে বলত, সেই সাপের মুখেই নাকি পুঁথি ফেরত পেয়েছিল ওঝা। বাইরের লোক তো কেউ আর সন্ধান নিতে পারে নি, মনসামঙ্গল আজো এ বাড়িতে রয়েছে কিনা।

বসন্ত রায় সর্পাঘাতে মারা গেলেন, তাঁর মৃতদেহ কলার ভেলায় নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর ছেলেরা দেশের বাড়িতে তালা দিয়ে কলকাতায় গেছেন আর সেই অবধি ফিরে আসেন নি।

অহি সব কথা শুনেছে, তাই তার একান্ত আগ্রহ, গোপনে একবার ভালো করে খুঁজে দেখবে—সেই পুঁথি আছে কিনা বাড়িতে। আর যদি থাকে, কি আছে সেই মনসামঙ্গল গ্রন্থে যার জন্য তার পিতামহ প্রাণ হারালেন।

আমারও যেন মনে হত, ও বাড়িতে কি রহস্য আছে। ছোটবেলায় যে শুনেছিলাম চালতা ডালে বেহ্মদত্যি পা ঝুলিয়ে বসে থাকে, এখন আর তা তত অকাট্য যুক্তি বলে বিশ্বাস করি না, তবু ওই বাড়িটা যে জন্মাবধি আমাদের কাছে মুখ বন্ধ করে চুপচাপ লতাগুল্মের দাড়ি ঝুলিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটাই কেমন অস্বস্তি, বুঝিবা কিছু অহেতুক ভয় সঞ্চার করত মনে। ভয় করত তবু ইচ্ছা হত, ও-বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখলে হয়—এতোদিন মৌন সাধনায় ও কি মন্ত্র জপ করছে।

অহিকে আমার আগ্রহের কথাটাও বলতাম, ও তাতে উৎসাহিত হত। একবার পূজার ছুটিতে সে কলকাতায় গিয়ে ও বাড়ির চাবিটা এনে চুপি চুপি আমায় বললে,—গোপনে এনেছি, তোর আগ্রহাতিশয্যেই এনেছি। কাউকে না জানিয়ে আমরা দু'জনে ঢুকব।

তার জন্ম কলকাতায়, সে নিজেও ঢোকেনি কখনো ও-বাড়িতে। তার নিজের আগ্রহও কম নয় তার প্রমাণ পেলাম যখন রবিবার দিন দুপুরবেলায় নিজেই এলো আমাদের বাড়ি আমাকে ডেকে নিতে। রবিবারই প্রশস্ত দিন—সেদিন পাঠশালায় ছুটি, লোকজন থাকবে না। দুপুরটাই সব চেয়ে ভালো সময়—পথ-ঘাটও জনমানবশূন্য।

চেষ্টাচরিত্র করে তালা খুললাম, জং ধরবার কিছু বাকী ছিল না, দামি তালা, তাই একেবারে নষ্ট হয়নি। সমস্ত বারান্দা অপরিচ্ছন্ন। পায়রার বিষ্ঠা পুরু হয়ে জমা হয়ে আছে। চামচিকা উড়তে লাগল মাথার উপরে। ঘরের মধ্যে কী বিশ্রী একটা পুরোনো দুর্গন্ধ। সব কিছুতে ধুলো জমে আছে। সেকালের আসবাবপত্র। রূপা বাঁধানো হুকা, মোটা কাজ-করা পালঙ্ক। কাঁসা পিতল সব যেন লোহার মতা কালো হয়ে গেছে। এঘর থেকে ওঘরে যাওয়ার দরজায় মাকড়সায় জাল বুনে রেখেছে, চলতে মাথায় জড়িয়ে গেল। চারিদিকে আরশোলা আর ইঁদুরের বিষ্ঠা। জানালার কপাটগুলি কঠিন হয়ে লেগে আছে, খালি হাতে চেষ্টা করেও খুলতে পারলাম না সব।

আমাদের সাড়া পেয়ে রান্নাঘর থেকে একটা খ্যাকশিয়াল ছুটে পালালো। চারিদিক থম থম করছে। ওপাশে বাগানে ঘন নিবিড় জঙ্গল, এই খররৌদ্রেও যেন প্রায়ান্ধকার। চাকরবাকরদের ঘরখানা ভেঙ্গে গেছে। ধানের মরাই এর কিছুই নেই, তার তলায় অজস্র ইঁদুরের গর্ত ছিল, তার উপরেই ঘাস গজিয়েছে। একটা লাউডগা সাপ হেলেদুলে চলে গেল।

অহিভূষণ বললে, এ-বাড়িতে কোথাও ঠাকুর্দার সংগৃহীত সেই পুঁথিপত্র জমা আছে। সে সব জিনিষ আজো আছে কিনা কে জানে!

ঘরের ভিতর আবার এলাম। কুলুঙ্গিতে বছরের পর বছ রের পুরোনো পঞ্জিকা সাজানো। বেতের বড়ো ঝাঁপি—ঠাকুরমায়ের আমলের বাক্স হবে। প্রকাণ্ড বড়ো কঠিন কাঠের সিন্দুক—ছয়টা উঁচু পায়ার উপর দাঁড়িয়ে। উপরে ছোট রেলিং দেওয়া, তিনজন লোক শুতে পারে। সিন্দুকের মুখও উপরের দিকে, সুতরাং লোক শুয়ে থাকলে খোলা অসম্ভব। সুমুখে বিরাট আকারের কাচা লোহার তালা ঝুলছে, তাতে মরিচা ধরে গেছে। দু'পাশে সিন্দুরের পুতুল আঁকা ছিল, তার অস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়।

ঘরের এক কোণে একটা বড়ো আকারের কাঠের বাক্স। ডালাটা টানাটানি করে খোলা গেল। বিস্তর বই। পোকায় কেটেছে, ইঁদুরে খেয়েছে, আরশোলায় বাসা বেঁধেছে, তবু গ্রন্থাবলী সিরিজের অনেক বই—সংস্কৃত আর বাংলা—ওর মধ্যে দেখা গেল।

উৎসাহিত হয়ে অহি সব বই নামিয়ে ফেললে। জ্যোতিষ, সামুদ্রিক বিদ্যা, গানের বই, কত কিছু আছে। 'আলালের ঘরের দুলাল,' 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম,' 'স্বর্ণলতা'—সে যুগের সাহিত্যের এই সব বইও পাওয়া গেল। কিন্তু পুঁথি কই? ঠাকুর্দার সেই সব পুঁথি অহি খুঁজতে লাগল।

বাক্সটা খালি হয়ে যেতেই বুঝতে পারলাম, তার তলাটা মেজেতে ভালোভাবে বসেনি, তাই সামান্য নাড়াতেই 'ঢকর' 'ঢকর' শব্দ

করছে। আমি বললাম—সম্ভবত এই বাক্সের তলাতেও কিছু আছে। পেলামও। দু'জনে বাক্সটাকে ঠেলে একদিকে সরিয়ে দিতেই নজরে পড়ল সরাঢাকা মাঠের মুখ। মাটির বড়ো জালাকে এদেশে 'মাঠ' বলে। গৃহস্থের বাড়িতে মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদ রাখবার জন্য যেমন দরকার সিন্দুক তেমন দরকার ছিল ঘরের কোনও নিভৃত ও নিরাপদ কোণে মাটিতে পোতা 'মাঠ'। ওর উপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়াও চলত।

মাঠের মুখের সরাটা সরিয়ে ফেললে গভীর গহ্বর দেখা গেল। সেখানে সূচীভেদ্য অন্ধকার। হাতে একখানা বাঁশের লাঠি ছিল, সেটা ভিতরে চালিয়ে দিয়ে দেখে নিলাম—কিছু জিনিষপত্র বাধছে লাঠির ডগাটায়। অহি তৈরী হয়ে টর্চ নিয়ে এসেছিল—ওই যে পুটলি—কাপড়ে বাঁধা পুঁলি। ওতেই নিশ্চয় সেই পুঁথিপত্র আছে—বলে পরক্ষণেই সে গহ্বরে হাত ঢুকিয়ে একটি কাপড়ে বাঁধা পুলিন্দা তুলে নিয়ে এলো।

উল্লাসে উত্তেজনায় আমরা দু'জনেই তখন কাঁপছি। ঘরে আরো আলো আনবার আশায় আমি একটা জানালা খুলে দিতে গেছি, অহি পুলিন্দাটি খুলতে বসেছে, এরই মধ্যে চক্ষের নিমেষে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। সহসা আমার চোখ অহির দিকে পড়তেই আমি চমকে গেলাম। পুলিন্দার একদিক অহি খুলতে ব্যস্ত, অন্য দিক হতে এক বিষধর কালকেউটে বেরিয়ে এলো এবং দেহের সবটা বের করবার আগেই অহির হাতে এক ছোবল বসিয়ে দিলে। আমি হা—হা করে ছুটে আসতেই সে মুখ গুটিয়ে আবার পুলিন্দাটির মধ্যেই আশ্রয় নিলে।

তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হল না। দুটি বিমূঢ় অপরিণতবয়স্ক তরুণ যুবকের কাছে সে

যেন এক প্রহেলিকা। কী যে করব, কী যে করা উচিত কিছুই স্থির করতে পারলাম না। মনে হল ভীষণ ঝড় উঠেছে, সোঁ সোঁ হাওয়া বইছে, কড় কড় বাজ পড়ছে। আমার সুমুখে আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু অহি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে আর সাক্ষাত যম তখনো কি আশ্রয় নিয়ে আছে সেই পুলিন্দার মধ্যে, না সেই অন্ধকার গহ্বরে পাতাল প্রবেশ করেছে কে জানে।

যন্ত্রচালিতের মতো অহিকে তুলে নিয়ে আমাদের পাঠশালা ঘরে বেঞ্চের উপর শুইয়ে দিলাম। হায়, তখনও হয়ত সময় ছিল, বিষ উপরে উঠবার আগে কঠিন বন্ধনে বিষ রোধ করা যেত। কিন্তু কে আমাদের সেই পরামর্শ দেবে ?

আমি ছুটলাম। বেহারা পাড়ায় পরেশ বেহারা ছিল সাপের ওঝা। তাকে ডাকতেই তার সঙ্গে আরো অনেকে এলো। পাঠশালা রবিবারেই কোলাহলমুখর হয়ে উঠল। পরেশ যতটা যা জানে ঝাড়ফুক করলে, কিন্তু কিছুই হল না। অহির শরীর তখন বিষে নীল হয়ে গেছে। সে তখন সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে।

এরপর আর সেই পোড়োবাড়িতে কেউ গেছে কিনা জানিনে। সেই পুঁথিগুলিরও আর সন্ধান করিনি।

খাতার ক'টি পাতা

ওঃ, ঘুমিয়ে যে কি আরাম, তা বোধ হয় এর আগে এমন করে কোনদিন অনুভব করিনি। বোম্বাই হতে দূর গুর্জরের বেট দ্বীপ, ফের বেট দ্বীপ হতে ওখা, দ্বারকা, জামনগর, রাজকোট হয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে যেদিন আমেদাবাদে পৌঁছুলাম তখনই আমার অবস্থা কাহিল। আমেদাবাদে বড়দা ছিলেন, গিয়ে শুনি দাঙ্গার গণ্ডগোলে তিনি ছুটি নিয়ে বৌদিদের দেশে রাখতে গেছেন। দেশে মানে বাংলা দেশে। From frying pan to fire—কথাটা বড়দার মনে ছিল কিনা জানি না। যাক সে কথা, কিন্তু আমার যে একটা হিল্লে হওয়া দরকার। ছোড়দা থাকেন অমরাবতী, প্রায় দুই দিনের রাস্তা, সেখানে যাব কি যাব না ইতস্তত করছি, এমন সময় শহরে আগুন লাগল। মহাত্মা গান্ধী রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম, সহসা বিষম শব্দ, লোকজনের ছুটাছুটি। প্রথমে আমিও আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটেছিলাম, কিন্তু অচিরেই কৌতূহল দমন করতে না পেরে অকুস্থলে গেলাম।

একটি টংগা হ'তে দুজন লোক নামছিল, একজনের কাছে ছিল হাত বোমা, পড়ে গিয়ে ফেটে একজনের ভবলীলা সেখানেই সাঙ্গ হয়ে গেছে, আর একজনের অবস্থাও সঙ্কটজনক। দুটি দেহই নিয়ে গেল পুলিসে। পড়ে রইল রাস্তায় অনেকখানি রক্ত আর তার মধ্যে জড়াজড়ি করে দুটি টুপি—দুরকমের। রক্তের মধ্যে ওই দুটি টুপি গোটা ভারতবর্ষের চেহারার প্রতীকের মতো দেখাতে লাগল। কলকাতা—নোয়াখালি—বিহারের ঘটনা চোখে দেখি নি, এতোখানি নররক্ত জীবনে কোনদিন দেখিনি, এই ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম।

হাওয়ার বেগে ছুটে গেল দুঃসংবাদ নানাভাবে পল্লবিত হয়ে। তারই প্রতিধ্বনি ঘটল দুচারটা—উত্তরে দক্ষিণে। সন্ধ্যা আটটা হতে সান্ধ্য আইন চলছিল সহরে, সেটা বর্দ্ধিত হয়ে মহরম উৎসবের সময়টায় ছত্রিশ ঘন্টাব্যাপী কারফিউ অর্ডার জারি হয়ে গেল। সুতরাং আমেদাবাদে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠল।

গেলাম সবরমতী আশ্রমে, হৃদয়কুঞ্জে প্রণাম জানিয়ে আসবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। হৃদয়কুঞ্জ সেই কুটির, মহাত্মা গান্ধী যেখানে দশ দশটা বছর বাস করেছিলেন। ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল একদা এই বালুকাবিস্তৃত বেলাভূমিতে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রার্থনা সভায়, এই নদীমুখী কুটিরে। ওখানকার ধূলা তুলে মাথায় দিলাম, অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ডাণ্ডীযাত্রার একখানি রঙিন চিত্র—হৃদয়কুঞ্জের দেওয়ালে লাগানো।

পূর্ণ হৃদয়ে আশ্রম ত্যাগ করে চলে এলাম। ছোড়দার কাছেই যাই। কাছের টাকা পয়সা ফুরিয়ে এসেছে, তাছাড়া এই দুর্যোগময় দিনে যত্র তত্র ঘুরে বেড়ানোর দুর্ভোগও চরমে উঠেছে। অমরাবতীর উদ্দেশ্যে গাড়ীতে চাপলাম আমেদাবাদে।

আমেদাবাদ হতে সুরাট, সুরাট হতে ভুষাওয়াল, ভুষাওয়াল হতে বান্দেরা, তারপর আর একটি মাত্র ষ্টেশন, গাড়ী বদলে ভোরবেলায় এলাম অমরাবতী।

বলা যত সহজ হ'ল, ব্যাপারটা তত সহজে হয়নি। সমস্তটা পথ বিষম ভীড়। একটার পর একটা রাত চলে গেল—ঘুম নেই। একটার পর একটা দিন চলে গেল, খাবার নেই। ঘুম ও খাওয়ার অভাবের চেয়ে তীব্র বোধ হ'তে লাগল, কতদিন যে স্নান নেই। সেই যে সপ্তাহের গোড়াতে বেট দ্বীপ পার হয়ে ওখা বন্দরে আরব সমুদ্রের জলের স্বাদ নিতে নেমেছিলাম, সেই লোনা জলের গুড়া আমার রোমকূপে লেগে আছে, লেগে আছে চুলের জটায়। ধূলিতে, ধোঁয়ায়, কয়লার গুড়ায়, সিগারেটের ছাইয়ে আর এতদ্দেশের শাখা আরোহী স্বভাবের যাত্রীদের সহজগতি-বাঙ্কে-আরোহণ-সমারোহে

কত মহাজনের পদধূলিতে অভিষিক্ত সেই জটাজাল। একমাত্র সান্ত্বনা সবরমতী আশ্রমের ছায়াটুকু, যেখানে তৃপ্তিতে প্রণাম করে মাটি তুলেছিলাম মাথায়। কিন্তু সে তো সাধারণ ধূলি নয়, বালি। ঝরে পড়ে নি কি এতদিনের অত্যাচারে ?

খুঁজতে খুঁজতে পেলাম ছোড়দার ঘর। বৌদি তো দেখে চিনতেই পারেন না। বলে উঠলেন,—ওমা, কি চেহারা গো! তারপর চা এনে দিলেন, কুশল প্রশ্ন করতে লাগলেন।

আমি বললাম, চা না দিয়ে যদি এক বালতি জল দিতে, আর এক টুকরা সাবান—তাতে আমি স্নান করে বাঁচতাম। আমার বিষম ঘুম পাচ্ছে, বসতে পারছি না।

বৌদি বললেন—তা আমি চেহারা দেখে বুঝেছি। চাটুকু খাও, আমি স্নানের জন্য গরম জল দিচ্ছি।

আমার চা খাওয়ার মধ্যে বৌদির চাকর 'হাজাম' ডেকে নিয়ে এলো। এদেশি পরামাণিক। বৌদি বল্লেন—শুধু দাড়ি কামানো নয়, বাবুর চুলটাও ভালো করে ছেটে দে দিকি।

বাংলার বধূ, এসেছেই না হয় মধ্যভারতের ধূলিজীর্ণ শহরে। তবু সেই স্নেহটাই উপচে উঠছে—যা নারিকেল ছায়াবীথি দিয়ে জলকুম্ভ কক্ষে নিয়ে আসা বাংলার পল্লীনারীর পক্ষেই শোভন হয়।

চুল কেটে, দাড়ি কামিয়ে, সাবান মেখে স্নান করে, 'ভাত' খেয়ে যখন বিছানার কাছে এলাম, তখন মনে হল স্বর্গলাভের আনন্দ বোধ হয় এর চেয়ে বেশী নয়। নিদ্রার আকাঙ্খায় আমার প্রতি অণু পরমাণু তখন ব্যাকুল হয়ে আছে।

ঘুমালাম, পড়ে পড়ে খুব ঘুমালাম। দু ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, যতক্ষণ খুশী। শেষের দিকে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেও ঘুমালাম। যখন উঠলাম, তখন বেলা পড়ে গেছে।

কাছেই চেয়ারের হাতলে রেখেছিলাম ধূলিমলিন হাফ সার্টটা, তার পকেটে আমার প্রাণপ্রিয় সিগারেট। "এ সিপ এণ্ড এ পাফ্" জীবনের অর্থ জানিয়ে দেয়। 'সিপটা' অভ্যাস করিনি, সামর্থ্যেও

কুলায় না। কিন্তু 'পাফ্'। সিগারেটের সূক্ষ্ম ধোঁয়া যখন মোলায়েম রেশমি রুমালের মতো ধীরে ধীরে বায়ুস্তর ভেদ করে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে তখন আমার মেজাজে, আমার মগজেও যেন পর্দার পর পর্দা খুলে যায়। সাহিত্য চর্চা যদি করতাম—আমার নাকি ভবিষ্যৎ ভালো ছিল, বলেছেন আমার একজন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক বন্ধু। কিন্তু তিনি সিগারেট খান না। তিনি জানেন না, সিগারেট সাহিত্যের চেয়েও মধুর, তার চেয়েও বায়বীয়। সিগারেটের সবচেয়ে শুভ ইঙ্গিতটা হচ্ছে যে সে নিজে পুড়ে যায়, রেখে যায় না কিছু। আনন্দ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অনন্তে মিশে যাচ্ছে, ভবিষ্যতকে ভারাক্রান্ত করতে কালো কালো অক্ষরের গ্রন্থি রচনা না করে।

সিগারেট এখন একটা চাই-ই—এই এক নাগাড়ে এতো ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে। কিন্তু জামাটা? চুরি গেল নাকি? শেষ পর্যন্ত নয় পয়সার সম্বল ঝুল পকেটে গড়াচ্ছিল, একটা দু'আনি আর একটা ফুটা পয়সা। দশটা পয়সা পুরা হলেও এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট কিনে ফেলতে পারতাম। তা হ'ল না দেখে ষ্টেশনের ভিখারিণীটিকে দু'আনিটি ভিক্ষা দিয়ে এসেছি। ফুটা পয়সাটা আর গোটা চারেক ডিলাক্স টেনর সিগারেট, আর সবচেয়ে মূল্যবান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে তখন অমিল একটা দেশলাইয়ের আধাআধি। আরও কিছু ছিল নাকি?

ছিল। বুক পকেটে সুকুল মহারাজের ঠিকানাটা আর ধনী বণিক ওঁকারনাথের একখানা কার্ড। শেষোক্ত জিনিষ দুটা পয়সা দিলেও পাব না, কিন্তু ও দুটোর প্রয়োজন আছে কি?

সুকুল মহারাজের নামটা পুরা বলব না। সুকুলজি—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের এমন জাজ্বল্য চেহারা গোটা ভারতবর্ষে আমি দেখিনি। তিনি গৃহী কি সন্ন্যাসী বলা শক্ত, কিন্তু সন্ন্যাসীর মধ্যেও এমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ক'জন আছেন কে জানে। জামনগরের খানিকটা এদিকে তিনি ট্রেনে উঠেছিলেন, কোথায় উঠেছিলেন লক্ষ্য

করিনি। আমি চলেছি বেট দ্বীপে। ভারত ছাড়িয়ে আরব সাগর—তারই খানিকটা এসেছে দেশের অভ্যন্তরে—নাম কচ্ছ উপসাগর। উপসাগরের বুকে এক মুঠি মাটি—বেট দ্বীপ। ওখা বন্দরের সুমুখে মাইল তিনেক জল পার হলেই পাওয়া যাবে। সেখানে দ্বারকানাথ রণছোড়জির মন্দির আছে, সেটা দেখা হবে। সঙ্গে সঙ্গে হবে সমুদ্র দর্শন, সমুদ্র স্নান, বিদেশাগত জাহাজের লোকেদের সঙ্গে আলাপ। সেই সব কথা ভাবছিলাম আর ময়ুর উড়ে যাওয়া বাজরা ক্ষেত, লম্বা গলা বাড়িয়ে চলা সারস-দম্পতীর গভীর সবুজ তামাকু ক্ষেত—এই সব দেখতে দেখতে চলেছিলাম। অকস্মাৎ যেন আমার সম্মুখে সূর্যোদয় হল, সুকুলজি মহারাজ এসে দাঁড়ালেন আমার সুমুখে।

উঠে দাঁড়ালাম। ভিতর হতেই যেন কে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। তিনি বল্লেন—বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে, বেটা।

ওটা বলা তার পক্ষে যত সহজ, আমার পক্ষে তাঁর দণ্ডায়মান মূর্তির সুমুখে বসে থাকা তত নয়। কিন্তু ভাবটা কেবল আমার মধ্যে নয়, আমার আশপাশ সবার মধ্যেই এই সৌম্যমূর্তি শুভ্রশ্মশ্রু সদাহাস্য মানুষটির উপস্থিতি একটা স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে দিলে। মানুষের দেহটা যে এমন চমৎকার স্থিতিস্থাপক তা এর আগে কে জানতো? সরে সরে বসে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল।

সুকুলজি বসলেন। তখন তাঁর আড়াল হতে বেরিয়ে পড়ল আটপৌরে সাদা শাড়ী পরণে একটি সুশ্রী কুমারী মূর্তি। তার হাতে ছোট একটি কাপড়ের থলে, তাতে সামান্য জিনিষপত্র। মেয়েটি বৃদ্ধের দক্ষিণে আর আমি বৃদ্ধের বামে স্থান গ্রহণ করলাম।

আলাপ হ'ল, কেননা এমন অকুণ্ঠভাবে কোন মেয়েকে আমি আলাপ করতে দেখিনি। আমার কুণ্ঠাই আমাকে পীড়া দিতে লাগল। কিন্তু তার ব্যবহারে মনে হল আমাকে যেন সে কতকাল চেনে।

নাম মৈত্রেয়ী, স্থকুলজি কখনো মৈত্রেয়ী মায়ী বলছিলেন, কখনো মৈত্রী, মৈ বলছেন কখনো বা। আর মৈত্রেয়ী তাঁকে স্থরু হতেই 'বাবা' বলছে। কিন্তু তিনি যে তাঁর জনক নন সে কথাটাও বলে ফেল্লে। এটা আমি আশা করিনি। পাতানো সম্পর্কটাও লোকে যাকে তাকে ভেঙ্গে বলে না, কিন্তু মৈত্রেয়ী বল্লে। সবটা খুলে বল্লেন বৃদ্ধ নিজে। মৈত্রেয়ী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী! ভ্রাতার সংসার পূর্ণ দেখেই তিনি প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন, ক'বছর পরে যখন ফিরে এলেন, তখন যুদ্ধ লেগেছে ইংরাজে জার্মাণে। এদেশেও তার ঢেউ লেগেছে। তাঁর ভ্রাতার সংসারটিতেও গুরু পরিবর্তন হয়েছে। ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ মৈত্রেয়ীর মা মারা গেছেন, মৈত্রেয়ীর বাবা যুদ্ধের দৌলতে আগের চেয়ে অনেক গুণ বেশী রোজগার করছেন, সংসারের শ্রী ফিরে গেছে। এসেছে নতুন একটি সুশ্রী তরুণী স্ত্রী, সে মৈত্রেয়ীকে তত অপছন্দ করত না, কিন্তু আশ্চর্য—তার বাবা, অর্থাৎ স্থকুলজির ভাই চাইছিলেন মৈত্রেয়ী তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর শান্তি নষ্ট না করে। পিতার নির্যাতনের হাত হতে উদ্ধার করলেন পিতৃব্য, মৈত্রেয়ীকে সেই সংসার হতে নিয়ে এলেন।

বলতে বলতে স্থকুলজি ব্যথিত হয়ে উঠলেন ;—একদিন ভাইয়ের ব্যবহার স্বচক্ষে দেখে মৈত্রেয়ীকে নিয়ে এলাম। তখন ও ছোট্ট মেয়ে, বছর দশেক বয়েস। নিজে কোনদিন সংসার করিনি, ওকে নিয়ে জামনগরে এসে বাসা করলাম। আগে এখানে শিক্ষকতা করতাম, সংসার ত্যাগ করে পুনর্বার চাকুরী গ্রহণে ইচ্ছা হ'ল না। মন্দিরে শাস্ত্রপাঠ করি, বাপ-বেটীর চলে যায় কোন রকমে। এখন ওর বয়স ষোল বছর হ'ল, একটা হিল্লে করে দিতে পারলে আমি আবার পথে বেরিয়ে পড়ি। বেটি আমার পায়ে শিকল দিয়ে রেখেছে।

সাধক জীবনর এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অবর্ণনীয় অমল সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে বৃদ্ধের মুখে, তাঁর শুভ্র শ্মশ্রুতে, প্রশস্ত ললাটে, মুক্তাধবল দন্তপংক্তিতে। সাদা জামাকাপড়, তার মধ্য হতেও তাঁর বিরাট বপু ও গম্ভীর ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুট পরিচয় আমাকে অভিভূত করে

ফেলেছিল। মৈত্রেয়ীর সঙ্গেই কথা বলছিলাম। কত দেশের কত বড় বড় পণ্ডিত তাদের বাসায় আসা যাওয়া করেন শুনলাম। তাদের সঙ্গে কথা বলে বলেই যে সে এমন অকুণ্ঠ হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম, সে শিক্ষা পেয়েছে এই পরিবেশের মধ্যে এক উচ্চ আদর্শের, যাতে অহেতুক লজ্জা, অন্যায় কুণ্ঠার ছায়া পড়েনি তার মনে। মৈয়েত্রীর বাম নাসিকায় জ্বলছে ছোট্ট একখানি হীরার নাকচাবি। বোধহয় দশ বছর বয়সে চলে আসবার সময়ে যে হীরাটা পরা ছিল সেটা আর পালটানো হয়নি। বয়সের পরিমাণে সেটা একটু ছোটই দেখাচ্ছে। কিন্তু এই হীরার মত নির্মল তার বালিকামনও এতোটুকু সংকোচ সন্দেহের ছায়ায়, এতোটুকু লজ্জা-কুণ্ঠার বর্ণে প্রতিভাত হয়নি—এটা যেন আমাকে বিস্মিত করে দিলে।

পিতৃ-পরিচয় সে গৌরবের সঙ্গেই দিলে, বল্লে, সুকুল মহারাজ বল্লে জামনগরের ছেলে-বুড়ো সবাই চেনে।

ট্রেন হতে নামবার সময় তার সাদা কাপড়ের থলেটা ইচ্ছে করেই ফেলে গেল কি না জানি না। ফিরে এসে ট্রেনের জানালা দিয়ে ব্যাগটা চাইলে। হাত বাড়িয়ে দিলাম ব্যাগটা। চাঁপার কলির মত নরম সুশ্রী প্রসাধনহীন আঙ্গুলগুলি লাগল আমার ধূলি-মলিন সিগারেটজ্বলা নিকোটিন রঙ্গানো আঙ্গুলে। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে বল্লে—ঠিকানাটা লিখে নিয়েচেন তো? আসবেন কিন্তু অবশ্য অবশ্য ফিরবার পথে যখন জামনগরে নাববেন। ওই সময় কাশীর পণ্ডিত বলভদ্র শর্মার আসবার কথা আছে বাবার কাছে। এলে পরিচয় হবে। আচ্ছা নমস্তে।

চলে গেল তারা। ঠিকানাটা লিখে বুক পকেটে রেখেছিলাম। সেটা খুলে পড়লাম।......নাম সুকুল (সুকুলজি মহারাজ)...... মন্দির, জামনগর। খুঁজে বের করা কঠিন নয়, কঠিন নয় সুকুল মহারাজের পায়ের শিকল খুলে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করা। ক্ষণিকের জন্য মনে হ'ল—তার চেয়ে পুণ্যকর্ম বুঝি পৃথিবীতে নেই। কিন্তু

আমি কেন, তার জন্য তো পণ্ডিত বলভদ্র শর্মারা রয়েছেন, রয়েছেন আরো কত শিষ্য প্রশিষ্যের দল যারা সুকুল মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করে জীবন ধন্য করতে পারেন। বিশেষ করে আমি বিদেশী, ভিন্ন ভাষাভাষী। কিন্তু তবু ওই যে অকুণ্ঠ আমন্ত্রণ, ওই যে উদার আহ্বান, সহজ নমস্কার—এর কি কিছু অর্থ নেই? এ কি সব বৃথা?

দ্বারকা হতে ফিরবার পথে নেমেছিলাম জামনগরে। নামতেই মাথায় ঢুকলো প্রসিদ্ধ সোলারিয়াম (Solarium)—সূর্যরশ্মি দিয়ে যেখানে নানা রোগের চিকিৎসা হয়। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের একমাত্র সোলারিয়াম—গেলাম সেখানে, ঘুরে ঘুরে দেখলাম সব বিভাগের কাজ। যন্ত্রের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ব্যবহার বুঝিয়ে বল্লেন একজন সদয় ভদ্র চিকিৎসক। বিজ্ঞান প্রণতি জানাচ্ছে সূর্যকে যার জ্যোতির দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রাচীন যুগের ঋষি গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। মনটা হাজার হাজার বছর পিছনে চলে গেল, দেখতে লাগল বল্কল-পরিহিত দীর্ঘ জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সমুদ্রে স্নান করে উঠে পূর্বাস্য হয়ে করযোড়ে স্তোত্রপাঠ করছেন—তার সুমুখে নীলসিন্ধু মন্থন করে উঠছেন জবাকুসুমসঙ্কাশ মূর্তি, প্রকাশিত হচ্ছে জগত জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাবের সঙ্গে।

বিমনা হয়ে কি ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম, জামনগরে পথে পথে অগণিত মন্দির ও মসজিদ আছে পাশাপাশি। কোন বিরোধ নেই। জৈন মন্দির, হিন্দু মন্দির, গিরিধারী মন্দির দেখতে দেখতে এলাম সেই মন্দিরে। ঠিকানাটা পকেটে ছিল, ভুল করিনি বিন্দুমাত্র। প্রশস্ত মন্দিরতল, শুভ্র শীতল মর্মর প্রস্তরে আবৃত। প্রণাম করে কিছুক্ষণ বসলাম, দেহমন শীতল হয়ে গেল। একপাশে কাঠের বেদী করা, একটি তাকিয়াও আছে। সুমুখে ছোট কাষ্ঠাসনে শাস্ত্রগ্রন্থ রেখে পাঠ করা হয়। এখানেই তবে সুকুল মহারাজ শাস্ত্র পাঠ করেন। মহারাজের বাসভবনও নিকটেই হবে।

উঠে গেলাম সেই দিকে। পাথরের ছোট বাড়ী, পাথরের

গাঁথনিটা বাইরে হতেই চোখে পড়ে। বাড়ীর সুমুখে ফুলবাগান, একটা ছায়াকর বড় গাছ, ছোট পথ গিয়েছে বারান্দার দিকে। কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। কেউ কোথাও নেই। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। পথ দিয়ে উটের পিঠে বোঝা চাপিয়ে নিয়ে গেল দেহাতী মানুষ, মন্থরগতি উটের গলায় ঘণ্টা বাজতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কা'কে জিজ্ঞাসা করি? এটা মহারাজের বাসভবন কিনা তাই ভাবছি আর ইতস্ততঃ করছি, এমন সময় গৃহমধ্যে সুললিত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারিত হয়ে উঠল। শকুন্তলার শ্লোক, একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছে কোমল মধুর নারীকণ্ঠ। সেই বর্ণনা, কণ্বমুনির আশ্রম হ'তে শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করছেন, আশ্রমের তরুলতা হতে পশুপক্ষীটি পর্যন্ত অভিভূত হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম পরিষ্কার বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত পাঠ। তারপর পায়ে পায়ে চলে এলাম। ট্রেনের দেরী নেই, রাজকোটের গাড়ী ধরতে হবে। দেখা করতে দ্বিধা হল, মৈত্রেয়ীর এ স্বর্গে আমার হানা দেওয়ার অধিকার নেই, তাকে উদ্ধার করবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

অলসভাবে বালিশটা কোলের উপর তুলে নিয়ে দেখি, সিগারেট দেশলাইসহ ওঁকারনাথের কার্ড আর সুকুল মহারাজের ঠিকানা লেখা কাগজখানা বৌদি আমার বালিশের নীচে রেখে জামাটা কাচতে নিয়ে গেছেন।

হারানো সুর

"ব্রজপুরে যাবার তরে
চরণেরে বলি কত,
(কথা) না শোনে, কথা না মানে,
কুপথে ধায় অবিরত।"

কে যেন অনেক দূর হতে অতি মিষ্টি সুরে অনেকদিন আগে শোনা সেই পুরোনো গানটি গাইছে। সাধুচরণ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে বারান্দায় বসলে।

এখান থেকে দেখা যায় অদূরের ইস্কুল বাড়িটি। টিনের চাল দেওয়া টানা লম্বা বারান্দা, কাঁচা মাটির পোতা, মূলীবাঁশের বেড়া দেওয়া। উদ্বাস্তু উপনিবেশের এই ইস্কুল বাড়িটিতে সম্প্রতি একটি রেডিও আনা হয়েছে। বারান্দায় অনেকে ভিড় করে বসে গান শুনছে। সাধুচরণের ইচ্ছা হয়, সেও ওখানে যায়। কিন্তু তার শরীর বড় দুর্বল। হাঁটতে ইচ্ছা হয় না। শুধু ওই গানটির সুর ওর কানের ভিতর দিয়ে যেন মরমে প্রবেশ করে ওকে একটা প্রবল আকর্ষণে টানতে থাকে।

ঘরের দাওয়ায় সাধুচরণ চুপ করে বসে শুনতে থাকে। রেডিওর গান কখন বন্ধ হয়ে বক্তৃতা শুরু হয়েচে, ইস্কুলের বারান্দায় ভিড় পাতলা হয়ে এসেচে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। নিজের মনেই গুণ গুণ করে সাধুচরণ কখন গাইতে শুরু করেছে—

'ব্রজপুরে যাওয়ার তরে
চরণেরে বলি কত।'

সাধুচরণকে গাঁয়ের সবাই চরণ বলে ডাকত। সে জাতে কাহার, বৃত্তিতে ছিল পাল্কির বেহারা। কাহার পাড়ায় তাদের বাড়ির পাল্কিখানাই ছিল সবার চেয়ে বড়ো। তার বাবা পরাণ কাহার ছিল ডাকসাইটে জোয়ান, যেমন চেহারায় পালোয়ান, তেমনি ওস্তাদ লাঠিয়াল। সে একা লাঠি নিয়ে দাঁড়ালে দুশ' লোককে ঠেকাতে পারত। শোনা যায়, তার হাতে লাঠি খেললে বন্দুকের গুলির সাধ্য ছিল না যে তাকে ঘায়েল করবে। ফলে গ্রামে গ্রামান্তরে জমি দখল, কান্দোড়-বিল ছেঁচা কি এমনই নানা কাজিয়ায় তার ডাক পড়ত। গাঁয়ের জমিদার বাড়িতেও সে পুরো তিনটাকা বেতনে পাইকের কাজ করেছে কতকাল। ভিন্ গাঁয়ে কাজিয়ায় লড়তে গিয়ে সেই পাহাড় প্রমাণ পুরুষ পরাণ কাহার মারা গেল। সংবাদটা এ গাঁয়ের কেউ প্রথমে বিশ্বাস করেনি। তারপর যখন তার মুণ্ডহীন দেহটা অন্য সঙ্গীসাথীরা গাঁয়ের নদীর ঘাটে নৌকায় করে নিয়ে এলো তখন সকলের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। কাজিয়াটা তখন দুই গাঁয়ের মধ্যে পাকাপাকি হয়ে দাঁড়াল।

সাধুচরণ তখন ছেলে মানুষ। সে তার মায়ের সঙ্গে হাপুস নয়নে কেঁদেছিল এইমাত্র মনে আছে। ক্রমে সে যখন বড় হল তখন ওদের সম্প্রদায়ের মধ্যে লাঠিয়ালের সংখ্যা কমে এসেছে। ওদের পাড়াতেই বাস করত বুড়ো রসিকদাস। সে পরের জমিতে হাল চষত, পাট বুনত, ধান কাটত,আর রোজ সন্ধ্যায় একটি একতারা বাজিয়ে হরিনাম করত। সেই রসিকদাস যখন এই গানটি গাইত, সাধুচরণের মনে হত বুঝি কথাগুলি তাকেই বলেছে সে। চরণ যে ব্রজপুরে না গিয়ে কেবলই কুপথে যায় এতে সাধুচরণের আক্ষেপের অবধি ছিল না। সেই অবধি সে কুপথ-বিপথ সব এড়িয়ে নিজেও রোজ হরিনাম করা শুরু করেছিল।

কতদিনের কত কথা মনে পড়ে। সাধুচরণ লাঠি খেলা শিখল না, কাজিয়া করা পছন্দ করল না। জোতজমি যা ছিল তা নিজহাতে চাষ করা শুরু করলে। বিয়ে, পৈতে বা মেয়ে শ্বশুর বাড়ি

দেওয়া নেওয়ায় তখনও কেউ কেউ পাল্কি ডাকত। সাধুচরণ বেহারার কাজ করতেও যেত। তাতে দু-পয়সা উপরি আয় হত।

দিন একভাবে কাটছিল তার। বাপ পরাণ কাহার মারা গেলে যতটা দুঃখকষ্টে পড়েছিল, একদিন তা কাটিয়ে উঠল। সাধুচরণ এইবার একটু গুছিয়ে সংসার করতে চাইলে।

পাড়ার খুড়ো ছিনাথ ছিল ভারি গরিব। নিজে সে নেশাভাঙ করে কোথায় পড়ে থাকত ঠিক থাকত না। ছিনাথ খুড়োর বউ কায়েৎ পাড়ায় ধান ভেনে, গরুর জাবনা কেটে কষ্টেস্থষ্টে যা জুটিয়ে আনত তাই দিয়ে তার আর মেয়ে সৈরভীর পেট চালাতো। কিন্তু গরিবের মেয়েকে বিয়ে করবে কে? সৈরভীর জন্যে বর খুঁজতে গরজ নেই কারো। সকলের অলক্ষ্যে সৈরভী তাই বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছিল।

সাধুচরণের খুব ইচ্ছা ছিল—সৈরভীকে সে ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু ছিনাথ খুড়ো কথাটা শুনে বেঁকে বসল। দু'কুড়ি টাকা নগদ চায় বুড়ো। তার দুগ্‌গোপিত্তিমের মতো মেয়ে। অত টাকা সাধুচরণ সংগ্রহ করতে পারে নি, তাই একবছর সময় চেয়েছিল, আশা ছিল—অঘ্রাণের ফসল তুলে টাকাটার ব্যবস্থা করতে পারবে সে। সাধুর মা বলেছিল, দু'কুড়ি টাকা দিয়ে সৈরভীর মতো ধিঙ্গি আনতে হবে কেন, দেশে কি আর মেয়ে নেই। এই অঘ্রাণেই সে দেখেশুনে ছোট্ট টুকটুকে বউ আনবে।

সেই কাল অঘ্রাণ সত্যই এলো, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। পাশের দু'দশখানা গ্রামে আগেই আতঙ্ক ছড়িয়েছিল, এবার সাধুচরণের গ্রামেও দুর্গ্রহ দেখা দিল। হাটবারে হাটুরেদের মধ্যে আলোচনাটা কেউ কেউ শুনেছিল। হাটের পরদিন সকালবেলায় পূব আকাশ যখন সোনার রোদে হেসে উঠেছে তখনই দেখা গেল পশ্চিম আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। একটা আর্তনাদের কলকোলাহল ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল এবং যখন হুড়মুড় করে ঝড়ের গতিতে সেই দুর্বার প্রবাহ এসে পড়ল তখন কে

যে কোথায় গেল, কার যে কি হল কেউ তার হিসাব রাখল না। সাধু একটা গভীর ঝোপে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, ঝড় চলে গেলে তাকিয়ে দেখল—সমস্ত গ্রামখানা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। লুটপাটের পর একটা চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কে বেঁচে আছে কে মরে পড়ে আছে তা দেখবারও কেউ নেই। সেই মহাশ্মশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাধুচরণ শুধু লক্ষ্য করলে তাদের বাড়িটা পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার মা মরেছে। আর ছিনাথ খুড়োর কুঁড়েখানা কাত হয়ে পড়ে আছে। ছিনাথ যথারীতি বাড়ি ছিল না। তার বউ মাথায় লাঠির বাড়ি খেয়ে মরে পড়ে আছে। আর সৈরভী? তন্ন তন্ন করে খুঁজলে সাধুচরণ—সৈরভীকে খুঁজে পেল না।

আজ বেশি করে মনে পড়তে লাগল সাধুচরণের—সৈরভী সব কথা জানত। সেই অগ্রাণেই সাধুর সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা একরকম ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে মাঠে পথে ঘাটে দেখা হলেই হাসি-মুখে সৈরভী মাথা নীচু করে চলে যেত। সাধুর ইচ্ছা হত, তাকে ছুটো কথা বলে। একদিন বলেও ছিল।—সৈরভী সোমত্ত মেয়ে, সে কথার অর্থ বোঝেনি এমন নয়, শুধু মুখে আঁচল দিয়ে হেসে পালিয়ে গিয়েছিল। ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাধুচরণ।

বৃদ্ধ রসিকদাস যে গান গাইত সেই গান কণ্ঠে নিয়ে সাধু দেশ-ত্যাগী হল।

তার পর ভিক্ষা। যত পথ চলে, সাধু গান গায় আর ভিক্ষা করে—

'কার করেছে ননী চুরি
মিছেরে বদনাম,
আমার ছুধের ছেলের নাম।
কত ছানা মাখন ঘি
আমার ঘরে অভাব কি?
কত সিকেয় রেখেছি।

(গোপাল মোর) ক্ষীর ননী সর ছানা খেয়ে
আঙ্গিনায় বেড়ায়,
কারো দুয়ারে না যায় ॥

সাধুচরণ গান গেয়ে গেয়ে পথ চলে। কিন্তু সেই পরিচিত একখানি মুখ আর কোথাও খুঁজে পেল না। একটি একতারা জুটেছিল। ভিক্ষার ঝুলি আর একতারাটি সম্বল করে সে দূরের পথ পাড়ি দিয়ে চলতে লাগল। 'ব্রজপুরে যাবার তরে চরণেরে বলি কত।' কোথায় সেই ব্রজপুর, কতদূর তার ব্রজপুর? পথ যে আর ফুরায় না।

ট্রেন না, ষ্টিমার না, শুধু চরণ-তরী ভরসা। তাতে যদি দেখা মেলে।

পথে দেখা মিলল অগণিত জনতার। সাধু যেমন গ্রাম ছেড়ে এসেছে, এরাও তেমনি সবাই দলে দলে চলেছে—ছেলে, বুড়ো, শিশু, নারী। কোথায় চলেছে তা কেউ জানে না। এখান থেকে তাদের বাস উঠেছে তাই সবাই চলেছে—সেই আদিম যাযাবরদের মতো। যে যেটুকু পারে তার জিনিষপত্র মাথায় পিঠে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে। এদেরও কি সৈরভী হারিয়েছে? সাধুচরণ ওদের মনের কথা জানতে চায়। শুধু বেঁচে থাকা যদি সমস্যা হত তবে এরা সাত পুরুষের ভিটার মায়া ছেড়ে পথে নামত না। বাঁচবার মতো বাঁচা, মানসম্মান নিয়ে বাঁচা—তা যদি না হয় তবে পশু-পাখীর মতো দিন গুজরানের জন্য কে এত কষ্ট সইবে?

সাধু কাজ পেয়ে যায়। বৈতালিক চাই একজন—যে এই চলমান জনস্রোতকে চাগিয়ে রাখবে, ভেঙ্গে পড়তে দেবে না তাদের মনোবল। একদিন তার বাপ পরাণ কাহার হা-রে-রে-রে ডাক ছেড়ে সঙ্গীসাথীদের মন চাঙ্গা করে দিত। সেই রক্তস্রোত যেন অনুভব করে সাধু তার শিরায় শিরায়। একতারায় সে নতুন সুরে গান ধরে, কণ্ঠে আপনিই তার কথা যোগায়। কে যে বয়ান বেঁধে দেয় তা সাধু নিজেই জানে না। যে কথা তার হৃদয়তন্ত্রীতে, দেহের শিরা

উপশিরায় প্রতিটি রক্তবিন্দুতে বাজছে সেই কথাই তার গানে মূর্ত হয়ে ওঠে। মুহ্যমান মানুষ মুহূর্তের জন্যও দম নেয়, ফিরে তাকায়, আবার জেগে ওঠে নবীন উৎসাহে।

নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ। পতিত জমি, জলা, জংলা,— মনুষ্যবাসের অনুপোযাগী। ওরা সেখানেই এসে পত্তন বসায়।

সাধু কাহার, গায়ে তখন যেন তার অসুরের জোর। সাতটা জোয়ানের কাজ একা করে। তার নিজের জন্য কিছু নয়—সকলের জন্য করে। সবার আপন সে, সবার জন্যই সে। কিন্তু তার দিকে কে তাকায়? সে কি খায় না খায় কে দেখে? কার এত অবকাশ আছে? অতিশ্রমে অনিয়মে সে ক্রমে ভেঙ্গে পড়ে। সম্বল তার ঐ একতারাখানি। তাই নিয়ে সান্ত্বনা পেতে চায়। ছোট্ট চালা-ঘরখানির দাওয়ায় বসে প্রতি সন্ধ্যায় সে রসিকদাসের মত গান করে। ব্রজপুরে যাওয়ার গান নয়—নতুন মানুষের জয়গান, নতুন জীবনের জয়গান।

ওদেরই শ্রমে গড়ে তোলা উদ্বাস্তু উপনিবেশের ইস্কুল বাড়িতে রেডিও এসেছে। কে বুঝি রেডিওতে পল্লীগীতি গাইছে—

'ব্রজপুরে যাবার তরে
চরণেরে বলি কত।

কে গাইল ও গান, কে জানে ও সুর? তবে কি তারা এখনও বেঁচে আছে? এদেশে কি তারাও এসেছে? ওদের মধ্যে কি সেই সৈরভীও থাকতে পারে না? দূর আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাধুচরণ।

এ কালের কাহিনী

দুনিয়ার মজুর—এক হও!

দুনিয়াকা মজদুর—এক হো!

ক্রমে ম্রীয়মান ধ্বনি দূরে চলে গেলে অমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শূন্য চোখে চারিদিক তাকালো। সারা বাড়ী খাঁ খাঁ করছে। মঞ্জরী বারান্দায় অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে কাছে ডেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। ছেটেবেলায় মা-মরা ছেলেকে মঞ্জরী মানুষ করেছিল। বৌদি বলে ডাকতো বটে, কিন্তু আসলে সে তো ওর মায়ের মতোই ছিল।

বিমল মারা গিয়েছে আজ। রাস্তায় পুলিশের গুলিতে বীরের মতো মৃত্যু বরণ করেছে, না মিলের দারোয়ানের গোপন গুলিতে মারা গেছে তাতে মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু যার গুলিতেই সে মরুক বিমলের মৃত্যু বীরের মৃত্যু। বিমলকে শহীদের সম্মান দিয়ে ওরা নিয়েও গেছে যেন রাজকীয় সমারোহে।

অমল চলৎ-শক্তি-রহিত, মঞ্জরীর বয়স হয়েছে। তবু এই দুটি মানুষকে শেষ মুহূর্তে দেখিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা ওরা করেছিল, সেজন্য অমল কৃতজ্ঞ। নতুবা হয়ত পরদিন বিমলের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যেত, কিন্তু তখন তো তাকে চোখের দেখাও দেখা যেতো না।

শেষ-দেখা মঞ্জরীও দেখল। তার হাতে ধরে মানুষ-করা দেবর, বন্ধ্যা নারীর স্নেহের অবলম্বন সন্তান তুল্য বিমলকে রক্তাক্ত দেহে শায়িত দেখেও সে কাঁদল না। এমন যে একদিন একটা কিছু ঘটবে এ যেন সে আগেই আশঙ্কা করেছিল। সে শুধু অনুরোধ করল, বৃদ্ধ শ্বশুরকে একটা টেলিগ্রাম করতে—যদি তিনি এসে

শেষ দেখা দেখতে পারেন। নবদ্বীপের শেষ গাড়ীটাও চলে গেলে অমল বললে—রাত সাড়ে বারোটা বাজে, আর কতক্ষণ এরা শবদেহ আগলে বসে থাকবেন—এদের নিয়ে যেতে দাও।

পঙ্গু স্বামী, বৃদ্ধ শ্বশুর, নিজে নারী, কা'র ভরসাতে সে বিমলের মৃতদেহ ঘরে রেখে দেবে? আর ওর সঙ্গীরাই বা তা ফেলে যেতে চাইবে কেন? অগত্যা অনিচ্ছাসত্বেও সম্মতি দিতে হল। জয়ধ্বনি করতে করতে সবাই বিমলের শবদেহ নিয়ে চলে গেল।

মঞ্জরী নিজের কথা ভাবে না, ভাবে এই দুর্ভাগ্য সংসারের কথা। অমল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র, বিজ্ঞানে তার কৃতিত্বের কথা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র থেকে সুরু করে সবাই স্বীকার করতেন। বোমা তৈরী করতে গিয়ে হাত উড়ে যায়। জেলে ছিল। সেখানে পুলিশের জুলুমে, কি পা পিছলে পড়ে, পা ভাঙ্গে। সে লিখতে পারে না, হাঁটতে পারে না। কিন্তু কথা বলতে পারে। চিন্তাশক্তি কমেনি, বরং বেড়েছে।

আগে ইংরেজ তাড়াবার উদ্যোগে ব্রতী ছিল। ইংরেজ গেল, দেশ স্বাধীন হল। অমল ছাড়া পেয়ে বাড়ী এলো—পঙ্গু অমল। তাকে দেখে বাপও চোখ মুছলেন। আর মঞ্জরী? সে দৃঢ়পদে এগিয়ে এলো। তার স্বামীকে সে চেনে।

ওই মাথাই কাল হোলো। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু মানুষের দুঃখ ঘোচে না, বরং বাড়ে। অগুণতি অভাব। বাবা বুড়ো হয়েছেন। মা অনেকদিন গত হয়েছিলেন। বিমল চাকুরীতে ঢুকে দু'পয়সা আনছে দেখে বাবা বিদায় চাইলেন। তিনি গেলেন তার সাধন ভজন নিয়ে নির্লিপ্ত থাকবার আশায় নবদ্বীপে।

বিমল যে কারখানায় ঢুকেছিল সেখানে যে সব ক্রিয়া-কলাপ ঘটতো সব সে এসে তার দাদার কাছে বলতো। দাদার কাছে পরামর্শ পেত। ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে শ্রমিকের স্বার্থ জড়িত, ইউনিয়নকে কিভাবে ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচিয়ে সুগঠিত করে তুলে শ্রমিককেও বাঁচানো যাবে সেই সব বিষয়ে দুই ভাই গভীরভাবে

আলোচনা করত। জেলে বসে এই সব বিষয়ে পড়াশুনা করেছিল অমল, এতো দিনে সেটা কার্যকরী ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুবিধা পেয়ে সেও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। কেবল মঞ্জরী এর মধ্যে আশঙ্কার কিছু আছে বলে সন্দেহ করতো। অমলের বাবার গৃহত্যাগের কারণটা মুখ্যত ধর্মালোচনা হলেও নেপথ্যে বাপে ছেলেতে এই সব বিষয়ে কিছু মতদ্বৈধের আঁচ পেয়েছিল সে। কিন্তু কোন পক্ষকেই সে কিছু বলতে পারল না। শ্বশুর নবদ্বীপে চলে গেলেন।

সকাল সাতটায় শ্বশুর এসে পৌঁছলেন। বাইরে দাঁড়িয়েই 'বৌমা' বলে মঞ্জরীকে ডাকলেন তিনি। খোলা দরোজা দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল মঞ্জরী, কাছে এলো, কিন্তু প্রণাম করতে পারল না। 'বিমলের কি অসুখ, কেমন আছে সে?'—জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। টেলিগ্রামে বিমলের অসুখের কথাই লিখেছিল অমল।

রুদ্ধ কান্না ভেঙ্গে পড়ল এবার, মঞ্জরী নিজেকে আর রুখতে পারলে না। ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে বললে,—বিমল বেঁচে নেই বাবা।

ক্রমে সব বিবরণ শুনলেন তিনি, স্থাণুর মতো বসে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর বললেন,—অমল কোথায়?

উপরে থেকেও অমল বুঝেছিল বাবা এসেছেন। রেলিংএর পাশে ঝুঁকে পড়ে বাবাকে দেখেই সে ভিতরে গিয়ে বসে পড়েছিল। এ শোকে সান্ত্বনা নেই, বলবেন বাবা। দু'দিন ভুগে গেল না। রোগ হলনা যে চিকিৎসা করবে। জলজ্যান্ত যুবক পুত্র কাজে গিয়েছে, ফিরে এলো তার রক্তাপ্লুত মৃতদেহ, তাও তিনি শেষবারের মতো একটু চোখের দেখা দেখতে পেলেন না। এর চেয়ে শোকাবহ আর কি হতে পারে! কিন্তু বিমল যে বীরের মৃত্যু বরণ করেছে, সে যে শহীদ হয়েছে বাবাকে তা বুঝিয়ে বলে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না, সে চেষ্টাও বৃথা। অমল তাই প্রায় লুকিয়ে বসে রইল।

বাবা উপরে এলেন একেবারে বিকেলে। তখন তিনি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। এসে বসলেন একেবারে অমলের কাছে। অমল

মাথা নীচু করে রইল। বাবা যদি আজ ধরে মারেনও তবু কিছু বলবার মতো সাহস নেই অমলের।

বাবা বললেন,—বিমল শহীদ হয়েছে শুনলাম, তার সঙ্গীরা তাকে ফুলের মালা পরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ওদের কোন্ উপকারটা হয়েছে বলতে পারিস্! দল বেঁধে চীৎকার করলেই কি কারো উপকার হয়?

দাবী আদায় হয়—বললে অমল।

দাবী কিসের? বল্ প্রার্থনা। কিন্তু দাবী বা প্রার্থনা কোনোটাই কেউ চিরদিন পূরণ করতে পারে না যদি না দাবীর সঙ্গে সঙ্গে দেনাও মেটাতে না চাও। শ্রমিক যদি ভালোভাবে কাজ করে, সে যদি নিপুণ হয় তবে তার দেনা শোধ হল, সে তার কর্তব্য করল। তখন যদি তার পাওনা না পায় তবে সে রুখে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই যে বিমলের সঙ্গী সাথীরা কেবলই রাজনীতি করছে, কাজ চুলোয় গেছে—এতে তাদের দেনা তো তারা মেটাচ্ছে না, কেবল দাবীই জানাচ্ছে। দাবীর টাকা কে দেবে, কি ভাবে দেবে!

পুত্রহারা বৃদ্ধের বুকে ক্ষত, আজ তাকে বুঝাবে কে? অমল সে চেষ্টায় বিরত থাকে।

তিনি বলে চললেন,—আমারও ছোটবেলায় বড়ো দুঃখে কেটেছে, লেখাপড়া শিখতে পাইনি টাকার অভাবে। খুব অল্প বয়সে তাই এক কারখানায় কাজ নিতে বাধ্য হই। যা রোজগার করতাম তাতে গ্রাসাচ্ছাদন চলত কিন্তু আমার মন উঠতো না, আমার ধারণা ছিল আমি আরো বড়ো হওয়ার যোগ্য। আমি দল পাকাইনি, ঝগড়া করিনি, সোজা নিজের ভাগ্য নিজে রচনা করতে লেগে গিয়েছি। গড়েও ছিলাম। এই বাড়ী ঘর বিষয় আসয় আমার শ্রমে অর্জিত। এক কানাকড়িও আমি চুরি করিনি, ভিক্ষে করিনি, কাউকে ঠকাইনি। সৎভাবে ব্যবসায় করে উপার্জন করেছি।

অমল বললে,—এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে বাবা। একতাই শক্তি, সঙ্ঘবদ্ধতাই একমাত্র বাঁচবার পথ, নতুবা যারা শক্তিমান,

বিত্তবান, যারা মিল কলকারখানার মালিক তারা অসহায় মজুরদের কোন কথাই মানতে চাইবে না। বেচারীরা খাটবে তবু ক্ষুধার অন্ন, পরনের বস্ত্র পাবে না। এই যে লড়াই—এ লড়াই গোটা ধনবণ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই বাবা।

বাবা চুপ করে থাকেন। ভালো বাংলার চোখাচোখা শব্দগুলি তার কানে ঝন্ ঝন্ করে বাজতে থাকে। 'ধনবণ্টন' কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করেন দু'একবার।

অমল আর কোনো কথা বলে না। দু'জনেই চুপচাপ। এক সময় বাবা উঠে পড়েন, বলেন—বোমা তৈরী করে তোর হাত উড়ে গেল, পুলিশে পিটিয়ে পা খোঁড়া করে দিলে—এর এটা সান্ত্বনা ছিল—তুই যুঝেছিস ইংরেজের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিমল যুঝছিল কার বিরুদ্ধে? তেল কলের মালিক স্বরূপচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা আমার পুরোণো দোস্ত-এর পোলা, আমাকেও 'কাকাবাবু' বলে ডাকতো। ছোটবেলায় কতদিন ঘরেও এসেচে। তোর মায়ের হাতের তৈরী খাবার চেয়ে চেয়ে খেয়েচে। অবশ্য তখন ওরা এত বড়লোক হয়নি। প্রথম যুদ্ধে ওর বাবা আমার চোখের সুমুখে ফুলে ফেঁপে বড়ো হয়ে গেল, দ্বিতীয় যুদ্ধে স্বরূপচাঁদ কোটি টাকা কামিয়েছে। কিন্তু তাই বলে মানুষটাও কি পাল্‌টে গেছে? আমি দেখা করতে চাই স্বরূপচাঁদের সঙ্গে। জান্‌তে চাই এ বিপদের মূল কোথায়।

পরদিন বাবা কখন বেরিয়েছেন অমল জানে না, স্বরূপচাঁদ অয়েল মিলের সুমুখে হাজার লোকের ভিড়। গেটে সশস্ত্র প্রহরী। কেউ ভিতরে যেতে পারছে না। বৃদ্ধ দৃঢ়পদে এগিয়ে গেলেন।

দারোয়ান বাধা দিয়ে রুখে দাঁড়ালো। তিনি বললেন—তিনি শেঠজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। দারোয়ান টিটকারি দিয়ে উঠল। শেঠজি কারখানায় থাকেন না সে কথাও শুনিয়ে দিলে।

ভুল হয়েছিল তাঁর। ঝোঁকের মাথায় শিবতল্লা না গিয়ে চলে এসেছেন শিবপুরে। ফিরবার মুখে দুচার জন করে বিশ ত্রিশজন

লোক জুটে গেল যারা তাঁকে চেনে। তিনিই যে তাদের সহকর্মী শহীদ বিমলের বৃদ্ধ পিতা একথা জেনে ক্রমে অনেকেই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানাতে এলো। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে চাইলেন না। এরা সবাই ধর্মঘটি, দিন তিরিশেক ধর্মঘট চলছে কারখানায়। তারই ক্লান্তি ও দৈন্যের ছাপ সবার মুখে। তার বিমলও এদের একজন হয়ে এইভাবে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল ভাবতেও বৃদ্ধের চোখে জল এলো। তিনি জোর পায়ে চলে এলেন।

শিবতল্লা পটি। শিউকিশনের কাছে কতবার এসেছেন তিনি এখানে। শিউকিশনের ছেলে স্বরূপচাঁদ এখন মোকামের হাল ফিরিয়েছে, হয়তো দুদিন পরে শিবতল্লা ছেড়ে বালিগঞ্জে 'ম্যানশন হাঁকাবে।

এখানেও দারোয়ানের কড়াকড়ি, তবু একজন পরিচিত পুরাতন কর্মচারী এসে পড়ায় বৃদ্ধ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেন। মোসাহেব দল নিয়ে স্বরূপচাঁদ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। প্রাচীন কর্মচারিটি গিয়ে কানে কানে কি বলতেই স্বরূপ-চাঁদ স্বয়ং অভ্যর্থনা জানিয়ে হাঁক দিয়ে উঠলেন—আরে আইয়ে আইয়ে 'বিশোয়াস' বাবু, তস্‌রিফ রাখিয়ে। তারপর বহুৎ দিন বাদ। শুনেছিলাম আপতো আভি বৃন্দাবন মে—

বিমলের বাবা বাধা দিয়ে বললেন—বৃন্দাবন নয়, নবদ্বীপে থাকি। তোমাদের খবর সব কুশল তো।

স্বরূপচাঁদ একটু বিরক্ত হলেন, পারিষদবর্গ রীতিমত ঘুরে বসে বৃদ্ধকে নিরীক্ষণ করলে। 'তোমাকে' বলে সম্বোধন করে শেঠ স্বরূপচাঁদ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাকে, এ কোন আহাম্মক বাঙ্গালী বাবু।

বৃদ্ধ ভুল করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন নি, তিনি আর 'কাকাবাবু' নন্—'বিশোয়াস' বাবু হয়ে গিয়েছেন। বিশ্বাস না করলেও তিনি যে 'বিশ্বাসবাবু' মাত্র, একথাটা স্বরূপচাঁদ আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলে। বললে, 'বিশোয়াসবাবু' কুশল পুচছেন, সাচ বলছেন, না তামাসা করছেন। আপনি তো জানে আপনার লেড়কা

ওই বিমল বাবুকো হাম কেতনা পীয়ার করতা থা। লেকিন্ ও ড্রিঙ্ক আপকে লিয়ে। পরন্তু বিমলবাবু হামকো কেয়া কিয়া। হামারা বেওকুফ মজদুর লোক—যো সাত চড়সে রা নেহি কাড়তা থা, উস্‌কো সব খেপানে লাগা। মিলমে ষ্ট্রাইক কিয়া। শেষ মে পুলিশকা পর হামলা কিয়া, ফিন্ জানভি দে দিয়া। এ হ্যায় সামাল্। ঔর দেখিয়ে, আপকা মাফিক্ শরীফ আদ্‌মি—আজ ক্যা, না রো-রোকে ঢুড়না পড়া।

একথার মধ্যে হাসির কি ছিল কে জানে। তবু পারিষদেরা হাসতে লাগল। একজন বলেই ফেললে—যেইসা কাম ঐসা ইনাম মিলা।

ইনাম্! বৃদ্ধ বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর আপাদমস্তক জ্বালা করতে লাগল।

স্বরূপচাঁদ বৃদ্ধের হাত ধরে এবার বিশুদ্ধ বাংলায় বলতে লাগলেন—বসুন বসুন, ওদের কথায় রেগে উঠে যাবেন না। আপনি নিজেই যখন এসেছেন তখন আমি ফেরাবো না। আমি এর ব্যবস্থা করবো।

স্বরূপচাঁদ কিসের ব্যবস্থা করতে চায় বৃদ্ধ বুঝতে পারেন না। তিনি ধপ করে মাটির উপর পাতা গদির উপর বসে পড়লেন।

স্বরূপচাঁদ বললেন—যে লেড়কা চলে গেছে, মামলা মোকদ্দমা করলে তো তাকে ফিরৎ পাবেন না। বরং আমি পাঁচ হাজার রূপেয়া দিচ্ছি। আপনি এ নিয়ে আর কোনো 'কেস' করতে যাবেন না।

টাকা! টাকা কেন? বিমলের জীবনের দাম? পাঁচ হাজার টাকা বিমলের জীবনের দাম? বৃদ্ধ মুখ ফেরালেন। স্বরূপচাঁদ বললেন—অবশ্য টাকা দিয়ে এই ক্ষতিপূরণ হয় না। কিন্তু ধরুন আপনি বুড়ো হয়েছেন। আপনার বড়ো লেড়কা ওমলবাবু ভি পঙ্গু আছে। ঘরে আপনার বহুজী আছে। সকলের জন্যই টাকার দরকার। তা যদি বলেন আমি না হয় পুরোপুরি দশ হাজারই দিচ্ছি।

'দ—শ হা—জা—র!' নিকটে উপবিষ্ট দালাল ঘনশ্যাম পাটোয়ারি টেনে টেনে কথাটা উচ্চারণ করে শোনালো—যেন এই অঙ্কটা এরা কেউ কোন দিন শোনেনি।

বিমলের বাবা এক সময় নিরুত্তরে উঠে দাড়ালেন, কোন কথার জবাব দেওয়ার তার ইচ্ছা হল না। বিলাসের প্রাচুর্যের মধ্যে বসে মোসাহেবকুলের পদলেহনে তৃপ্ত যারা মনুষ্য জীবনের দাম টাকার অঙ্ক দিয়ে শোধ করতে চায় তাদের কুৎসিত নগ্ন চিত্রটি নিজে দেখে বিভীষিকাগ্রস্থ হয়ে বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলেন। তিনি এসেছিলেন বন্ধু-পুত্রের বিপদের দিনে সহায়তার জন্য, ফিরে গেলেন এক পুত্রহারা পিতা হৃদয়ভরা হাহাকার নিয়ে। ঘরে গিয়ে অমল কি মঞ্জরী কাউকে কিছু বললেন না। চুপচাপ শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলেন।

তাঁদের এক কাল ছিল আর এ আর এক কাল! তিনিও এক কারখানায় কাজ করতেন। যা উপায় করতেন তাতে খুশি হতে না পেরে নিজেই অন্য উপায় খুঁজে নিয়ে ছোট ব্যবসায় সুরু করে-ছিলেন। ব্যবসায় বড় হলে চাকরি ছেড়ে দিলেন। কালে সেই ব্যবসায় বড় হল। বাড়ি ঘর সব হল।

কিন্তু ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে পাঠিয়ে কেউ তার ব্যবসায়ে ফিরে এলো না। অমল লেখাপড়ায় ভাল ছিল, রসায়ন শাস্ত্র ভালো করে শিখতে সে বিলাত যাবে, ফিরে এসে বড় করে রাসায়-নিকের কারখানা চালাবে—কত কল্পনা ছিল! কিন্তু কি সন্ত্রাসবাদের ঢেউ এলো। সব ওলোটপালট হয়ে গেল। বোমা তৈরী করতে গিয়ে অমলের হাত উড়ে গেল। পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। জেলের ভিতর পুলিশের অত্যাচারে পা ভেঙ্গে অমল চলাফেরার শক্তিও হারালে।

বিমলের উপর তার দাদার এই ঘটনার প্রভাব না পড়ে পারেনি। ফলে সেও রাজনীতিতে যত মাততো লেখাপড়ায় তত মন দিত না। ব্যবসায় ক্রমে মন্দা যাচ্ছিল। স্ত্রী বিয়োগের পরে সব ছেড়ে ছুড়ে নবদ্বীপ যাওয়াই ভালো মনে করলেন বিমলের বাবা।

সেই তাদের যুগ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ—তখন তারা কেউ কেউ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু অগুণতি লোক যে সারা জীবন ধরেই দুর্বহ যন্ত্রণা সহ্য করেছে, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অবিচার, অত্যাচার যত কিছু সয়েছে—সে কাহিনী তো অজানা নয়। চোখ বুজলে হাজার হাজার মানুষের মিছিল ভিড় করে আসে যারা চিরদিন শুধু ঠকেছে।

আজ তাই যুগ ফিরেচে, এ যুগ একতার যুগ। একক প্রচেষ্টায় যা সম্ভব হয়নি, একতাবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করলে তাই সম্ভব হচ্ছে। ধনীর দর্প, অন্যায় স্পর্দ্ধা নত হয়ে পড়ছে একতাবদ্ধ সংগ্রামী দীন মজুরের কাছে। অমল যে বলেছিল—দাবী—এতো সত্যই দাবী। প্রার্থনা নয়, দাবী, প্রাণের দাবী। তুমি বাঁচবে, খাবে, ছড়াবে, উড়াবে, পোড়াবে—আর আমরা তোমার সেই বিলাসের স্রোত জুগিয়ে যাবো নিজেরা অভুক্ত থেকে—এতো অন্যায়। তাই এখন আর প্রার্থনা নয়, দাবী।

পরদিন দেখা গেল স্বরূপচাঁদ অয়েল মিলের সম্মুখে মজুরদের সভায় বক্তৃতা হচ্ছে। বক্তা এক পলিতকেশ বৃদ্ধ, চিরজীবন যিনি মুখবুজে কাজ করেছেন আজ তারও মুখ খুলে গেছে। তিনি বলে চলেছেন প্রাণের দরদ দিয়ে। এতো সভাসুন্দর বক্তার আবেগপ্রবণ ভাবোচ্ছ্বাসময় কৃত্রিম কাঁদুনি নয়, সদ্য পুত্রহারা পিতার বুকের ক্ষত হতে রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে, তার প্রত্যেকটি কথায় তাই সত্য তিক্ততার স্বাদ! বক্তা আর কেউ নয়—তিনি বিমলের বাবা।

কলেজ স্ট্রীটের কাহিনী

রাত হয়েচে। সারাদিন খরিদ্দারের ভিড়, বকতে হয়, বোঝাতে হয়, বলে কয়ে বাজে বই গছাতে হয়, মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে হাসিটি লাগিয়ে রাখতে হয়—ধকল কি কম! এতক্ষণে দোকান বন্ধ করবার সময় হল। রঘুয়া কোলাপসিবল গেটটা টেনে দিয়ে এসেচে, তালা লাগান হয়নি। তালাটি লাগিয়ে দিয়ে ক্যাশ গুনতে হবে, তার আগে এক পেয়ালা চা চাই। রঘুয়া পাশের পরিতোষ কাফে থেকে দুটো চিংড়ি মাছের কাটলেট আর এক পেয়ালা 'কত্তার স্পেশাল' চা আনতে গেছে। এখুনি এসে পড়বে। হীরুবাবু অন্যমনস্কভাবে কাগজপত্র গুছিয়ে তুলছেন—এমন সময় বাইরে থেকে একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল—ভেতরে আসতে পারি?

অন্য সময়ে হলে বিনয়ে মুখব্যাদন করে হীরুবাবু বলতেন—'আসুন, আজ্ঞা হোক্—কি বই চাই দেখুন, এ মাসে কত ভালো ভালো নতুন বই বেরিয়েছে। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর তার দেহমন এখন ক্লান্ত, মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। বিশেষ করে ওর হতভাগা ভাগ্নেটা আজ এসেছিল সন্ধ্যার পরে টাকা চাইতে, মাঝে মাঝে প্রায়ই আসে। ওকে দেখলেই হীরুবাবুর মেজাজ বিগড়ে যায়। আজ আরো বেশি বেগড়াবার কারণ ঘটেছিল—ভাগ্নের সঙ্গে বকাবকির ফাঁকে একটা লাইব্রেরীর অর্ডার ফসকে গেল। হতভাগাটা নিজে এক পয়সা আয় তো করবেই না, আর কেউ করবে তাতেও এসে বাদ সাধবে, তাই তো হীরালালবাবু ওকে দুচোখ পেড়ে দেখতে পারেন না। একরকম তাড়িয়েই দিয়েছেন আজ, আর সেই অবধি ওর মেজাজটা খিঁচিয়ে আছে। সেই মেজাজেই জবাব

দিলেন—আজ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর কোন বই বিক্রি হবে না।

মুখ তুলে দেখলেনও না কে বলছে বা কি বলছে। রঘুয়া এসে পড়লে চা-টুকু খেয়ে ক্যাশ মেলাবেন তিনি, তার পর হিসেবপত্র লিখে ঘরে যেতে যেতে রাত দশটা উতরে কখন বারোটা বেজে যাবে তার ঠিক নেই। খাতাপত্র গোছগাছ করতে তাই তিনি এখন ব্যস্ত।

আবার নারী কণ্ঠে আবেদন এলো—একটু বিশেষ দরকার ছিল।

কি জ্বালাতন! খেঁকিয়ে উঠলেন হীরুবাবু, বল্লেন—বলছি তো দোকান এখন বন্ধ, সেলস্‌ম্যানরা সব খেতে গেছে, এখন বইপত্র কিছু বিক্রি হবে না।

বই কিনতে চাইছি না, আপনাকেই চাইছি।

কথাটা নতুন, খট করে লাগল হীরু বাবুর কানে। তাকিয়ে দেখলেন একবার মুখ তুলে, বললেন—আমার কাছে দরকার, তা অন্য সময়ে আসবেন, আমি এখন বড় ব্যস্ত।

মহিলাটি কিন্তু নাছোড়বান্দা, বল্লেন, দুমিনিট মাত্র সময় নেব আপনার।

আচ্ছা ফ্যাসাদ যা-হোক্। এ দিকে আবার রঘুয়া আসতে দেরী করছে। কাউণ্টার পেরিয়ে দরোজা পর্যন্ত যাওয়াও এক দুর্ঘট, হীরুবাবু বল্লেন—অপেক্ষা করুন, আমার চাকর আসচে, সে এসে কোলাপসিবল গেট খুলে দেবে।

বলতে বলতে রঘুয়া ধূমায়িত চা ও কাটলেট নিয়ে এলো এবং সে ভিতরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটিও ভিতরে এলেন। অন্ধকার হতে দোকানের ভিতরে আলোর সুমুখে এলে দেখা গেল সুশ্রী রুচিশীলা একটি তরুণী, যেন বিশেষ কুণ্ঠিত তার উপস্থিতি। হীরুবাবু কিছুটা বিরক্তির সঙ্গেই বললেন—বসুন।

সে না বসে বল্লে, আপনি ব্যস্ত আছেন এখন আর বসব না, কখন এলে আপনাকে একটু নিরিবিলিতে পাওয়া যায়? আমার একটি আবেদন ছিল।

হীরুবাবুর যে কখন অবসর তা তিনি নিজেই জানেন না। ভোর হতে রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত একটানা খেটে চলেছেন জীবনভোর, এর মধ্যে অবসর কোথায়? অবসর নিলে কি আর ছোট হতে এত বড় হতে পারতেন, না আজ এত বড় দোকানের মালিক হতে পারতেন। খরিদ্দারের ভিড়, লেখকদের ভিড়, পাওনাদারের ভিড়, একটা কাটে তো আর একটা জোটে। আর সেইটুকু লক্ষ্মীর দয়া আছে বলেই তো তিনি বেঁচে আছেন। নিরিবিলি তিনি থাকতে চান না, থাকতে পানও না। একটা না একটা ঝঞ্ঝাট জুটিয়ে রাখেন, যাতেই দু-দশ টাকা আসে তাতেই তাঁর আগ্রহ—তবে বলা বাহুল্য বই পত্রের বিষয়ে হওয়া চাই।

তাঁর একটু যেন করুণাই হল, ও বেচারী জানে না কার সঙ্গে সে কথা কইচে। তিনি কি কলেজে পড়া পুঁচকে ছুঁড়ি যে যখন তখন নিরিবিলি বসে থাকবেন। তিনি কত বড় একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মালিক। সংসারে সবাই তার দয়ার ভিখারী। একটু অনুকম্পার সুরে হীরু বাবু বল্লেন, নিরিবিলি বলতে হলে এখনই আমি সব চেয়ে নিরিবিলি; বরং আধ ঘণ্টার মধ্যেই দোকানের দুজন কর্মচারী খাওয়া দাওয়া সেরে এসে পৌঁছুবে। সরযু ঘর ঝাট দিয়ে ধুনা দিয়ে আর একবার বাজারে বেরিয়েছে, সেও এসে যাবে, তারপর সে আর রঘুয়া সব দরোজায় তালা লাগাতে থাকবে। ততটুকু সময় আপনি বসতে পারেন, বলতে পারেন কি আপনার বক্তব্য।

মেয়েটি সসঙ্কোচে বসলে। কাউণ্টারের উপরে ধূমায়িত চা ও কাটলেট, ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে—তবে একটি মেয়েকে সুমুখে বসিয়ে রেখে নিজে চা খেতে হীরু বাবুর বাধে না। চক্ষুলজ্জায় বাধবে সে পাত্রই তিনি নন। যদি খরিদ্দার হত, হত যদি কোন পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারীর বউ, রঘুয়াকে পাঠিয়ে তিনি এখনি নিজের জন্য আবার খাবার আনাতেন, এসব ভোজ্য সাদরে ধরে দিতেন এই মহিলাটিকে। এ মেয়েটি সে সব কিছু নয়, তবে সুশ্রী। কিছু

কিনবে না, শুধু কথা কইতে এসেচে। একটু জিরিয়ে নিয়ে ওর কথাটা শুনে নিলে ক্ষতি কি। কেমন একটু দয়াই জাগল মনে। রঘুয়াকে বল্লেন—আর এক কাপ চা আন্।

মেয়েটি সসঙ্কোচে বল্লে—না না, আমার চা লাগবে না, আমি শুধু আপনাকে ছুটি কথা বলতে এসেছি।

হীরু বাবুর চা প্রত্যাখ্যান করে কেউ পরিত্রাণ পায় না, সে অপমান তিনি সহ্য করেন না। বলে অমন যে জাঁহাবাজ মেয়ে অধ্যাপিকা সুকুমারি সেনগুপ্তা—তাকে পর্যন্ত দোকানে এনে চা খাইয়ে তবে ছেড়েচেন, আর এ বলে কিনা চা খাবে না। তেতে উঠতে দেরী হল না হীরুবাবুর, বল্লেন—তবে তো আপনার কথা শুনবারও সুবিধে হবে না আমার। চা খেতে খেতে না হয় শুনতাম। আপনি আসুন তাহলে।—বলেই তিনি আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

ছু'চার মিনিট কাটল বুঝি। ক্যাসমেমো বইগুলি গুছিয়ে তাকে তুলে ফেল্লেন, ক্যাস রেজিস্টারের অঙ্কটা টুকে নিয়ে এলেন। এবার চায়ের মৃত্থ গন্ধ নাকে আসতেই কাউণ্টারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন রঘুয়া আ রি এক কাপ চা এনে হাজির করেছে এবং সেই মেয়েটি স্থাণুর মত চেয়ারে চুপ করে বসে আছে।

রঘুয়াই বুদ্ধি করে কাপটা মেয়েটির সুমুখে নামিয়ে দিলে। হীরুবাবু এগিয়ে এসে বল্লেন—খান, চা খান, চা খেতে খেতে বলুন আপনার বক্তব্য।

অগত্যা কাপটা টেনে নিতে হয়। মেয়েটি লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বললে—আপনার বেশি সময় নষ্ট করব না। আপনি বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক, আপনি ইচ্ছা করলে নতুন লেখক লেখিকাদের বাঁচাতেও পারেন আবার মারতেও পারেন। সত্যি বলতে কি বাংলা সাহিত্যের আজ যারা দিকপাল রথী-মহারথী তারা সবাই অল্প-বিস্তর আপনার কাছে ঋণী। আপনার দয়া না পেলে তারা ক'জন আজ দাঁড়াতে পারতেন তাতে সন্দেহ আছে।

শ্রুতিসুখকর কথা কার না ভাল লাগে। হীরুবাবুও তাই খুশী হলেন, বল্লেন—সেকথা অবশ্য অল্প-বিস্তর সবাই বলে। সে দিন একটা কাগজে তো আমার জীবনীই ছাপিয়ে দিতে চাইলে। আমিই অনুরোধ করে তাদের নিরস্ত করলাম : আমি বাপু আড়ালে থাকতে চাই।

সেটা আপনার মহত্ত্ব। মেয়েটি চোখ তুলে তাকিয়ে বল্লে কথাটা, তারপর আবার মাথা নীচু করলে।

হীরুবাবু বল্লেন—আপনার জন্যে কি করতে পারি তাই বলুন। আপনি কি কিছু কিছু লেখেন ?

মেয়েটি লজ্জিত ভাবে বল্লে—হ্যাঁ লিখি, কিন্তু কোথাও বের হয়নি। এতকাল পূর্ববঙ্গে ছিলাম, কিছুদিন কলকাতায় এসেছি, কাউকে চিনি না, আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তবে হয়ত—কথাটা সে শেষ করতে পারলে না। হীরুবাবু বল্লেন—দেখুন আমি বই ছাপি বটে কিন্তু লেখার যাচাই হয় পত্রিকায়। সেখানে আপনি আগে লেখা ছাপিয়ে বের করুন, তারপর আসবেন—যদি পারি বই বের করে দেব।

ছোট একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি, বল্লে আমি কিন্তু ভেবে-ছিলাম আপনি ইচ্ছে করলে সবই পারেন, তাই কয়েকটি খাতা নিয়ে এসেছিলাম।

হীরু বাবু হাসলেন, বল্লেন—বই ছাপাতে টাকা লাগে, যা তা ছেপে টাকা জলে ফেলতে বসিনি আমরা।

তিরস্কারের মতোই শোনালো কথাটা, মেয়েটির হাতের কাপটা নড়ে গিয়ে খানিক চা পিরিচে উপচে পড়ল। কাপটা নামিয়ে রেখে সে বল্লে—সে তো ঠিকই, আচ্ছা নমস্কার।

উঠে চলে গেল সে, চেয়ার ঠেলে রেখে দরোজা পর্যন্ত, তার পর সিড়ি দিয়ে চটি টেনে পথে নামল, হীরুবাবু দেখলেন তাকিয়ে। রঘুয়া ভিতরে প্যাকিং কাগজ গোছাচ্ছে, নিকটে কেউ নেই। এক মুহূর্ত। যেন চমক লাগল তাঁর। চোখের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে গেল

মেয়েটি। এমন কত আসে কত যায় রোজ, কিন্তু এমন করে তাকাবার তাঁর ফুরসুৎ হয় না। ওর ওই গৌরবর্ণ, নিতান্ত নিরাভরণ আটপৌরে সাজসজ্জা ছাপিয়ে যৌবনের একটি অনাড়ম্বর মাধুর্য মৃদু সৌরভের মতো যেন তাঁকে ঘিরে ধরলে। ওই চায়ের কাপে আধা-আধি চা পড়ে আছে, পেয়েও খায়নি সে, চা খেতে তো সে আসেনি। কিন্তু যে প্রস্তাব নিয়ে সে এসেছিল তাও তো নেহাৎ ছেলেমানুষী, ঝানু ব্যবসায়ী হীরুবাবু এমন প্রস্তাব গ্রহণ করবেন কি ভাবে?

তবু হাতের চিংড়ি মাছের কাটলেটটা কেমন বিস্বাদ লাগতে লাগল যেন; কতটা গভীর বিশ্বাস নিয়ে সে এসেছিল, যাতে তার কোন অসুবিধা না হয় সে জন্য এ রাতের বেলাতেও আসতে ভয় পায় নি, হয়তো এখনও তাকে ডেকে ফেরানো যায়, কিন্তু এখনি না ডাকলে আর কোনদিন সে এখানে আসবে না। ভাবতে ভাবতে হীরুবাবু কখন যে রঘুয়াকে ডাকলেন, কখন তাকে নির্দেশ দিলেন ওকে ডেকে নিয়ে আসতে তা তিনি নিজেই জানেন না। হীরুবাবু কি ভাবছিলেন কে জানে? হয়ত ভাবছিলেন, ব্যবসায়ে লাখ লাখ টাকা মুনাফা করেছেন তিনি। বাংলা দেশে এমন কোন বড় সাহিত্যিক নেই যাকে তিনি ভাঙ্গিয়ে খান নি, আজ যদি অজ্ঞাত-কুলশীলা একটি তরুণীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে দু চার হাজার টাকা লাগেই তা লাগুক না। ততটা না হক, অন্তত পড়ে দেখবার জন্যে লেখাটা রেখে দিলেও তার মনে আশা থাকত, ভেঙ্গে পড়ত না একেবারে।

রঘুয়া ফিরে এলো, সঙ্গে সেই মেয়েটি। সে ফিরে এসে সস্মিত মুখে বল্লে,—আমায় কিছু বলছিলেন?

হীরুবাবু বল্লেন—লেখার খাতা নিয়ে এসেছিলেন বললেন, সেগুলি বরং রেখে যান, আমি সম্পাদকমণ্ডলীকে দেখাবো একবার। আমার এখানে যে সব বই বের হয় সবই একটি নির্বাচকমণ্ডলী আগে পড়ে দেখেন, তারা অনুমোদন করলে সম্পাদকমণ্ডলীতে দেওয়া হয়

লেখাটা আদ্যন্ত সম্পাদন করে দিতে—যাতে বানান, বাক্যরচনা কি শব্দ বিন্যাসে কোন শৈথিল্য না থেকে যায়।

মেয়েটি হেসে বললে—কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী কি নতুন লেখিকার লেখা পছন্দ করবেন, বিশেষ করে যার লেখা কোথাও কখনও বের হয়নি। বই বের করতে যে এত আড়কাঠ পেরুতে হয়, তা আমার জানা ছিল না। আপনার নিজের কোন ক্ষমতা নেই জানলে আপনাকে এসে বিরক্ত করতাম না। আমি ভেবেছিলাম, আপনি মালিক, আপনি ইচ্ছা করলেই কারো বই বেরুতে পারে, তাইতো ঘুরে ঘুরে এমন সময় এলাম যখন আপনি একটু সুস্থির হয়ে ছটো কথা শুনতে পারেন, তা দেখছি আসা বৃথাই হল।

খোঁচা খেয়ে হীরুবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠে টেব্‌ল চাপড়ে জবাব দিতে গেলেন—যা তার চিরাচরিত স্বভাব। গ্রাহ্য করেন না তিনি কোন লেখক লেখিকাকে। টাকা ছুড়ে ফেলে পাণ্ডুলিপি কেড়ে আনেন, মুখে তাঁর নরম-গরম চলতেই থাকে। যাঁরা তাঁকে চেনেন না তাঁরা চটেন, যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন ওটা তাঁর স্বভাব। বস্তুত নগদ টাকা পেয়ে পেয়ে অনেক গ্রন্থকার আর এ-ঘর ছাড়তে চান না, সামান্য ছুর্ব্যবহার তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না, বরং এই নীরস মানুষটিকে দিলদরিয়া বলেই তাঁরা ভাবতে অভ্যস্ত।

হীরুবাবু কিন্তু চটতে গিয়েও থেমে গেলেন। আর একদিনের কথা মনে পড়ল তাঁর। কিছুদিন আগে একবার নেহাৎ বাধ্য হয়ে এক লেখকের বিয়েতে বরকর্তা সেজে বিয়েবাড়ি গিয়েছেন। কন্যা-পক্ষের বেয়ানটি বড়ো জাঁহাবাজ মেয়ে। বে-থা মিটবার পরে তিনি হীরালালবাবুকে অন্দরে পরম সমাদরে পৃথগাসনে খেতে বসালেন। একে ডেকে তাকে ডেকে, পরিচয় করিয়ে দেন—ইনি বরকর্তা হেলবাবু। হীরালাল সংক্ষেপে 'হেল'—শুনে হীরুবাবুর মাথার মধ্যে যেন-রেল চলতে লাগল। কিন্তু মেয়ে মহলে পৃথগাসনের মর্যাদায় তিনি সমাসীন তায় বেয়াই-বেয়ান সম্পর্ক। অপমানটা মনে মনে হজম করে হাসি-মুখেই রাশি রাশি লুচি উড়িয়ে এলেন।

আজও প্রতিপক্ষ একটি মেয়ে, হীরালালবাবু যদি অল্প বয়সে বিগতদার না হতেন তবে ওর বয়সী নাতনি হতে পারত। ওই পুচকে ছুঁড়ির কিনা সাহস হল, হীরুবাবুর কোন ক্ষমতা নেই এত বড়ো কথাটা মুখের উপরে বলতে। সে কি জানে না বাংলাদেশের কতো সাহিত্যিককে তিনি হাতে ধরে তৈরী করেছেন, তিনি না চেনালে তাদের কেউ চিনত না, পুছত না। ডজনে ডজনে অমন কত কেরাণী সরকারী সওদাগরী অফিস কলম পিষছে। কলম ধরতে জানলেই লেখক হয় না। লেখা ছাপা হবে, বই আকারে বেরুবে, বই কাটবে, তবে তো সে লেখক, তবে তার নামডাক। তা ধরুন গিয়ে, তিনি কতো লেখকের লেখা ফিল্মে তুলে দিলেন, ওঁর নিজের স্বার্থ এইটুকু যে বইখানা ভালো কাটবে। নইলে বই সিনেমায় উঠলে লেখক টাকা পায়, অথচ তিনি প্রকাশক, তিনি কিছু পান না—এত বড় অন্যায়ও মুখ বুজে সয়েছেন তিনি। পরের জন্য কে এমন করে? সেই তাঁকেই কিনা দোকানে বয়ে এসে এত বড় অপমান করলে মেয়েটি। দোকান থেকে যেতে বলতে গিয়েও তিনি বল্লেন না, বরং গলাটা নামিয়ে বেশ মোলায়েম স্বরে বল্লেন—দেখুন, চটলে তো হয় না। বসুন, আপনার লেখাটা দেখান, দেখি কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। আর বই যদি আমরা ছাপিও, সেখানেই সব শেষ নয়। আপনাকে আরো লিখতে হবে। একখানা বই লিখে ক্ষান্ত হলে সে বই চলে না।

মেয়েটি চেয়ার টেনে বসে তার ছোট ব্যাগটি খুলে বের করলে তিনখানা মোটা বাঁধানো একসারসাইজ বুক, একখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। হীরু বাবুকে দেখিয়ে বল্লে,—এটি প্রথম ভাগ, আমার ইচ্ছা, বইটি এমন তিন কি চারটি ভাগে সমাপ্ত হবে। আপনি ইচ্ছা করেন তো রাখতে পারেন খাতাগুলি, চানতো নিজে পড়ে দেখতেও পারেন—কিন্তু কোন মণ্ডলীতে যদি পাঠাতে চান তবে আমি এখনি ফেরত নিয়ে যেতে চাই, কেননা ও বিষয়ে আমার কোন বিশ্বাস নেই। আসলে ও-সব মণ্ডলীর কথা। যারা বলেন তারা বইটা চেপে রেখে

লেখককে কেবল ঘোরাতে চান, পরিষ্কার জানেন, শেষ পর্যন্ত ফেরতই দেবেন—তবু আসল কথাটা চাপা দিয়ে কেবলই ঘোরাতে থাকেন। আর নিজে যদি পড়েন তবে মতামত কবে জানতে পারব তারও একটা নির্দিষ্ট সময় জানতে চাই।

হীরুবাবু আবার সেই 'হ্রেল' বাবু হয়ে পড়েছেন মনে হল—নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারেই বলে দিলেন, কাল এমন সময় আসবেন, তার আগেই আমি দেখে রাখব।

আচ্ছা নমস্কার—উঠে দাড়িয়ে নমস্কার জানালে মেয়েটি। কতদূর যাবে সে? যেন একটু অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্যেই হীরুবাবু বল্লেন—যদি দরকার মনে করেন, রঘুয়া আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।

সে উত্তরে মৃত্যু হেসে বল্লে—তার দরকার নেই, আমি এই নিকটেই থাকি, চিন্তামনি দাস লেনে। একটু এগুলেই বাসা। আচ্ছা, আমি কাল আসব।

মেয়েটি চলে গেলে হীরুবাবু খাতা তিনটি উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। পড়ে রইল তাব হিসাবের খাতা, ক্যাস মেলানো হয়নি তখনও, কাটলেটও সবটা খাওয়া হয়ে ওঠেনি। চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে তিনি খাতার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

ঝরঝরে স্পষ্ট মুক্তাক্ষর, দেখলেও চোখ জুড়ায়। মেয়েটির নাম খাতায় লেখা নেই, কেবল বই-এর নাম—'হে বন্ধু, বিদায়'। গ্রামের মেয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে আসছে, ডাকছে সেখানে ডাহুক-ডাকা বন, শীতল দীঘির জল, বাঁশবন, কাশবন, ক্ষেত-খামার, তুধল গাই, নতুন বাছুর—কত কী, কত কী!

মেয়েটি গ্রাম ছাড়ল কেন? সাধে কি ছেড়েছে? ছেড়েছে তার বাপ-মা-ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে। অসূর্যম্পশ্যা পুরনারী আজ পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। ওই প্রবহমান জনস্রোতে তারাও ভেসে চলে এলো শহরে। রাজনৈতিক বাটোয়ারায় দেশভাগ হয়, মানুষ ভাগ হয়, ভাগ হয় না বুঝি মানুষের মন। শৈশবের শত স্মৃতি বিজড়িত বাস্তুভিটার কথা সারা জীবনেও ভুলতে পারে না।

তাই উৎপাটিত হয়ে আসবার সময়েও সে ফিরে ফিরে তাকায় আর বলে—'হে বন্ধু, বিদায়'।

হীরুবাবু নিবিষ্টভাবে পড়তে লাগলেন। এ কী লেখা, এ যেন মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে চোখে জল বের করে দেয়। তিনি মাসে তিন চার খানা বই বের করেন সত্যি কিন্তু হীরুবাবু বড় ভীরু, পাণ্ডুলিপি দূরে থাক, ছাপা বইও তিনি পড়ে দেখেন না—যা দেখেন সে হল বই এর আকৃতি, অঙ্গসজ্জা, বড় জোর টাইটেল পেজ আর তার পেছনে বইএর দামটা লেখা থাকে—সেটা। প্রকাশক হিসেবে তার নিজের নামটা শুদ্ধ করে ছেপেছে কিনা তাও দেখবার তাঁর ফুরসৎ নেই, উৎসাহও নেই। ও-সব কিছু দেখবার জন্য বেতনভুক কর্মচারী আছে, তিনি শুধু দেখেন কি ভাবে বই কাটবে। কিন্তু আজ তাঁর কি হল? তাঁরও যে শৈশব ছিল তা-যেন তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর দেশ গাঁ সবও যে ঐ একই র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে ভিন্ন দেশ-এ পরিণত হয়েছে এসব আজ আবার নতুন করে মনে পড়ল তাই নয়, চোখে বার বার জল এসে গেল। এ কোন্ যাদু, কী খেলা! কাগজের বুকে কালীর আঁচড়ে এমন জীবন্ত ছবি আঁকা যায় এ যেন বিশ্বাস হতে চায় না, এ যেন নিজের জীবনেরই ছবি চলচ্চিত্রের মত মনশ্চক্ষুর উপর ভাসতে থাকে। একটা গভীর বেদনার নিবিড় অনুভূতিতে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

অনেক দুঃখ গিয়েছে জীবনে। কলকাতায় বেকার জীবন, মেসের টাকা দিতে না পারায় লাঞ্ছনাভোগ, অনন্যোপায় হয়ে খবরের কাগজ ফেরি করতে সুরু করা, ফুটপাথে পুরানো বই-এর ব্যবসায় দিয়ে বই-এর কারবার আরম্ভ আর তাই থেকে এই বই-এর দোকান, বই ছাপাবার ও প্রকাশ করবার আয়োজন, ছাপাখানা, দপ্তরীখানা, বই বিলি করবার ভ্যান, লাইব্রেরীর অর্ডার সংগ্রহের জন্য সেলসম্যান নিয়োগ—ছোট কারবার দশ দিকে ফুলে ফেঁপে আজ বিরাট মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। কিন্তু সংসারে কেউ নেই। বাবা আগেই গিয়েছিলেন, মা অনেক দিন ছিলেন। বিনা চিকিৎসায় কি প্লীহাজ্বরে

বৌ বিদায় নিয়েছে, আবার বিয়ে করবার আর সময় হয়ে ওঠেনি। একটা মাত্র বোন ছিল, বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসে দেশের জমিজমা সেই ভোগ দখল করত। দেশ বিভাগে সব ছেড়ে ছুড়ে পালিয়ে এসে সে দাদার আশ্রয় নিয়েছে। একটি মাত্র ভাগ্নে, সে ছোঁড়া ইঁচড়ে পাকা, কাজকর্ম করে না, সারাদিন রকবাজি, সিনেমার গল্প, আর মাঝে মাঝে এসে মায়ের নাম করে হাজির হয়—কিছু টাকা চায়। প্রথম প্রথম দিতেনও কিছু কিছু। এখন আর ওই অলস কর্মবিমুখ ছোকরাকে তিনি সইতে পারেন না। দোকানে ঢুকলে তাড়িয়ে দেন।

কাজের একটা নেশা আছে—সব বেদনা ভুলে তাই পেয়ে বসেছিল তাঁকে। টাকার জন্য তত নয়, কাজের জন্যই কাজ এই ছিল তাঁর একটা অভ্যাস। তাতে টাকাও এসেছে প্রচুর, ততটা তিনি হয়ত আশাও করেন নি।

হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রীতে যে আজ বেদন রাগিনী বেজে উঠল হীরালাল বাবু বুঝতে পারলেন না, বুঝতে চাইলেনও না। কি এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যবোধ তাঁকে উচ্চকিত উন্মথিত করে দিলে। তিনি নিতান্ত নীরস টাকা-আনা-পাই, সাড়ে বারো-পনের পারসেণ্ট কসা, চব্বিশ এম মেজার মাপা, ক্রাউন, ডিমাই, রয়্যাল, মিডিয়াম সাইজ বিচার করা নগণ্য প্রকাশক ও পরিবেশক মাত্র নন, তার অতিরিক্ত আনন্দলোকের ভাণ্ডারী হয়ে গেলেন তিনি। সাহিত্যের মধ্যে কি সুধা আছে এতদিন তাঁর চোখে পড়বার কোন কারণ ঘটেনি, তিনি তার বিক্রয় মূল্যই বুঝতেন। তার অতিরিক্ত কোন দাম তার যে সত্যই কিছু আছে এ কথায় তাঁর কোন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। বরং যারা বই লেখে আর যারা কেনে উভয় গোষ্ঠিকে তিনি কিছুটা অনুকম্পাই দেখিয়ে এসেছেন। কিন্তু আজ এ কি হল! ছাপাও নয়, মাত্র পাণ্ডুলিপি, তাতেই এত রস, এত বেদনামধুর নিবিড় আবেশ লুকিয়ে আছে এ খবর কে জানতো?

হীরুবাবু পাতার পর পাতা পড়ে যেতে লাগলেন আর তাঁর মন

সরে যেতে লাগল এই বাস্তব বন্ধুর ব্যাভিচারময় জীবন থেকে, কোলাহলময় সহর থেকে, অর্থ লালসার হানাহানি টানাছেঁড়ার গ্লানিময় পরিবেশ থেকে। তাঁর মন বিদায় নিতে চাইলে এই সংগ্রাম-সংকুল বর্তমান থেকে, তাঁর বিয়াল্লিশ বছরের বর্দ্ধিতশ্রী ব্যবসায় থেকে, লোকজন মুহুরী-কর্মচারীদের কর্তার উপর অবিমিশ্র ভয়ালুতা থেকে।

ও-মেয়েটি কে, ও-কি সত্যি কোন মানবী, না ছলনাময়ী নেপথ্য-চারিনী নিয়তি, যিনি হীরালালকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন তার গহ্বর-গুহার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আলোকের দেশে চলে যেতে সেই পাখী-ডাকা গ্রামখানিতে যেখানে তার শৈশব-বাল্য-কৈশোরের কত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে আজো পথের পাশে হাজার পুরানো দিনের স্মৃতির নিদর্শনে।

তন্দ্রাটা কেটে গেল। ঝনাৎ করে এক গোছা বড় চাবি কে রাখল কাউন্টারের উপরে। সরযু ফিরে এসেছে, দরোজায় বড়ো বড়ো তালা এঁটে দিয়েছে, রঘুয়া ঘর ঝাট দিয়ে সব গুছিয়ে গাছিয়ে রেখেছে তারপর একখানা কাগজে আগুন ধরিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে এসেছে—সেই কাগজ-পোড়া কটু গন্ধ নাকে এসে লাগল হীরু বাবুর। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে তিনি হাঁক দিলেন—সরযু, সরকার বাবু আর ভি-পি বাবুর খবর কি?

ঘড়িতে এগারোটা বাজল টং টং করে, রাস্তা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে শেষ ট্রাম চলে গেল।

বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠলেন হীরালালবাবু।

বন্ধু

বন্ধুবরেষু—

আপনার পত্র পেলাম। আমার পুত্রের বিবাহের ব্যাপারে আমার অনুমোদন চেয়েছেন, যদিও জানেন, অনুমোদন করি না করি, তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আপনার উদ্দেশ্য সফল হবেই, কারণ আপনি যে কুশলী কলাকার, যাদুকর শিল্পী। আপনি কি কোনকাজে ফাঁক রাখেন? যা করেন ভালো রকম বুঝে সুঝেই করেন।

আপনি আমার বাল্যবন্ধু নন, আপনার লেখা পড়ে আমি আপনার উপর শ্রদ্ধা পোষণ করতাম—এই মাত্র। তাই যখন প্রথম পরিচয় হল, দেখলাম আমরা সমবয়সী, দুজনে দুই কলেজে পড়লেও বিশ্ববিদ্যালয় হতে একই সঙ্গে বেরিয়েছি। আমার সামান্য অধ্যাপনার কাজ, কিন্তু আপনি লেখক, দেশ ও জাতি আপনাকে চেনে, জানে, ভালোবাসে, সম্মান করে। আমিও দেশবাসীর একজন হয়েই আপনার রচনার সমালোচনা করেছি, দেশবাসীর কাছে আপনাকে উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করেছি, বন্ধুকৃত্য করলাম মনে করেছি। অস্বীকার করবনা, আপনি বরাবর আমার সমাদর করেছেন, বাড়ীতে গেলে স্বামী স্ত্রী উভয়েই আমাকে বহুভাবে পরিতুষ্ট করেছেন। কিন্তু পরে বুঝেছি সে কেবল ঐ সব সমালোচনার সুর আরও উচ্চগ্রামে তোলাবার মতলবে।

যখন আমার সহকর্মী বন্ধুরা কয়েকজন মিলে একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন তখন তারা আমার সহযোগিতা প্রার্থনা

করলেন। তারা জানতেন আমার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে, আমার অনুরোধে আপনি দু'একখানি বই তাদের অবশ্যই দেবেন প্রকাশ করতে। আমার অনুরোধে আপনি রাজিও হলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি কথা রাখেন নি। আমার আর এক বন্ধুর কাগজের পূজা সংখ্যায় আপনার একটি লেখার জন্য আমার হাত দিয়ে তারা অগ্রিম টাকা পাঠিয়েছিল, আপনি সে টাকা আমার হাত থেকে নিলেন কিন্তু তাদের লেখা দিতে ঘোরালেন। ঘুরে ঘুরে তারা যখন না পেয়ে আমার দ্বারস্থ হল, তখন আমার লজ্জা এড়াবার জন্য আমি তাদের টাকা পকেট থেকে ফেরত দিলাম। সেখানেই যদি শেষ হত, তবু বুঝতাম ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় কাটল। সহসা আপনার কর্তব্য বুদ্ধি জেগে উঠল। আপনি তাদের একটি গল্প দিলেন।—ছোট গল্প বলে একেবারেই ছোট গল্প, তাদের কাগজের একটি পৃষ্ঠাও পুরলো না। বুঝলাম, 'বনফুলের' মত স্টাণ্ট দিলেন, মন্দ কি ? যদিও টাকার অঙ্কের পরিমাণে তা একটু অবিচার করা হয়েছে বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু লজ্জার পরিমাণ সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন 'শনিবারের লাঠি'তে সেই গল্পের উপরেই দণ্ড হানলে, তারা দাবি করলে সে গল্প আপনিই অন্য কাগজে ইতিপূর্বে লিখেছেন এবং তার চেয়েও মারাত্মক কথা, গল্পটা একটি বিলাতি পত্রিকা থেকে চুরি করা।

হাঁ, চুরি করা গল্প দ্বিতীয় বার ছাপবার ভার দিয়েছিলেন আমারই বন্ধুর পত্রিকায়—তবু আপনি আমার বন্ধু বলে আমি দাবী করি!

আমি বুঝি, আমি স্বল্পবেতনের অধ্যাপক মাত্র, আর আপনি মহামহিমান্বিত সাহিত্যিক। আপনি দিনে দিনে ঐশ্বর্যের সমারোহে ভিন্ন মানুষ হয়ে গিয়েছেন। গোত্রান্তর ঘটেছে আপনার। আপনি তখন যদি এই দরিদ্র অধ্যাপকের বন্ধুত্ব অস্বীকার করতেন আমার বলবার কিছু ছিল্ না। যে সময়ে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন আপনি আর আমি মোটামুটি একই স্তরের মানুষ ছিলাম।

বেশ মনে পড়ে আপনার বাড়ীতে যেদিন প্রথম চা খাই, সেদিনের কাপটি একটু ভাঙ্গাই দেখেছিলাম। যে বাড়ীতে আপনি তখন বাস করতেন সেটি এক অন্ধগলির প্রায়ান্ধকার ঘর। সে সময় বোধ হয় এই অধ্যাপকের বেহালার বাসভবন আপনার কাছে ভালোই লাগত। তাই প্রায়ই আসবার সময় সুযোগ হত। এখন আপনার চৌষট্টি খানা বই চলছে। প্রত্যেক বছরে পাঁচ ছ'খানি বই ছায়াচিত্রে প্রকাশিত হচ্ছে, নাটক অভিনীত হচ্ছে, বই-এর সংস্করণ হচ্ছে, নতুন বই বেরুচ্ছে। দু'হাতে টাকা পিটছেন। আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে মার্বেলের মেঝে। সেখানে চলতে গেলে আছাড় খাওয়ার ভয় হয় বলেই যাই না। আপনার গ্যারেজে ঝকঝকে গাড়ি, আমি আজ পর্যন্ত সে গাড়িতে কখনও চড়তে যাইনি। আর সেই গাড়ি থাকা সত্ত্বেও আপনি গত কয়েকবছরে একবারও বেহালায় আসবার সময় পান নি। আমার পত্নী যখন গুরুতর পীড়িত, আমার একজন ছাত্র সে কথা আপনাকে বলেও এসেছিল, তবু আপনার সময় হয়নি একবার দেখতে আসবার। এ সত্ত্বেও আপনি আমার বন্ধু, অন্তত তাই আমি মনে করি।

কিন্তু বন্ধুর উপকারের জন্য সহসা আপনার মন এত উদার হয়ে উঠল কেন জানিনা। আমার একমাত্র পুত্র অসীম, দরিদ্র অধ্যাপকের সকল স্বপ্নের একমাত্র আশ্রয়। তাকে আমার মনের মত করে মানুষ করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় সে প্রথম হয়ে আমার মুখ উজ্জ্বল করেছে, দরিদ্রের সংসার আনন্দময় করেছে। সর্বভারতীয় পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করে সে ভারত সরকারের উচ্চসম্মানের পদও পেয়েছে। যখন আমি ভাবলাম—আমার শ্রম বুঝি সফল হল—তখনই আপনার নজর পড়ল তার দিকে। আপনার বন্ধুর পুত্রের জন্য দরদ উথলে উঠল। আপনার রূপবতী গুণবতী সুশিক্ষিতা কন্যার সঙ্গে পরিচয় করালেন অসীমের। ধীরে ধীরে অতি নিপুণ ভাবে আপনি অসীমকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন। আপনার ঐশ্বর্য, খ্যাতি, প্রভাব, প্রতিপত্তি—কি

না আছে ? তার উপর আছে আপনার সুশ্রী কন্যা। মা আমার মহা ভাগ্যবতী। সে সুখী হোক্।

কিন্তু আর আমাকে উত্যক্ত করা কেন ? আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে কি আপনি খুশী হতে পারেন নি, আবার উলঙ্গ ক্ষতে নুনের ছিটে দিয়ে আমার কাছে পত্র দিয়ে তার বিবাহের জন্য অনুমোদন প্রার্থনা করেছেন! 'প্রার্থনা'-ই বটে। বালিগঞ্জ থেকে বেহালা দু-হাজার মাইল পথ, আমিও আপনার একান্ত অপরিচিত। তাই ডাকে পত্র দিয়েছেন। অসীম দিল্লী থেকে আপনার ওখানে এসে উঠেছে এই সুসংবাদ কি আমায় না জানালেই চলছিল না ? আপনি সুলেখক, আপনার রচনায় পাত্রপাত্রী আপনার সঙ্গে কথা কয়। আপনার বন্ধুর স্থানে আপনার কোন সৃষ্ট চরিত্রকে কল্পনা করে নিয়ে আমার জবাবটা তার মুখে বসিয়ে নিলেই পারতেন। আপনার পত্র লেখার পরিশ্রমটা বাঁচত।

আমি পিতা সেই সব পরিচয় নয়, আমি অধ্যাপক—সাহিত্যের সম্যক আলোচনা করাই আমার বৃত্তি। অধ্যাপক হিসাবে আমি আপনার বন্ধু নই,—গুণগ্রাহী, আপনার অপূর্ব রচনাশৈলীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল পাঠক। সেই হিসাবে আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহার স্মরণ না করেই আমি আপনার বন্ধুত্বের জন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। এবং সেই মন নিয়েই আপনার কন্যাকে আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি—সে সুখী হোক্। আপনিও তৃপ্তি অনুভব করুন। নমস্কার। ইতি—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নন্দী

বসির মিঞার গল্প

বসির মিঞাকে দেখে চিনতেই পারিনি। ছোট বেলায় এক পাঠশালে পড়েছিলাম, তখন তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল। লেখাপড়া তার বেশিদূর এগুলো না, সবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় 'বসিরুদ্দিন শেখ' লিখতে শিখেছিল, এমন সময় তার বাপ তাকে মক্তবে পড়াবার নাম করে নিয়ে গেল। সেই থেকে তাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি। তাই বলে কি আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি মাঝে মাঝে! খুবই হয়েছে এবং হলেই সে দৌড়ে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরেছে—ডাক দিয়েছে ছোট বেলার মতো—'এই যে কাত্তিকে!' একদিন হাটের মধ্যে কি কেলেঙ্কারী। বসির তখন বড় হয়ে উঠেছে, বেশ ডাগর ডাগর চেহারা। গায়ে গত্তি লেগেছে। বুকটা চিতানো, পিঠে একটা জুলি বয়ে গেছে, যেন হাওরের খাল তার মেরুদণ্ডে। কালো কুচকুচে চেহারার সেকি জৌলুস! চিতলমারির ব্যাপারীরা মাছ নিয়ে ফকিরহাটে বেচতে আসে তা আমরা বরাবর জানি। ওদের মধ্যেও যে এমন জোট ছিল তা জানা ছিল না। বসিরের সঙ্গে বচসা লেগেছিল মাছ গণা নিয়ে। মাছ তখন 'পণ' হিসাবে গণতি হয়। সের দরে ওজন হয় না।

ব্যাপারটা যত সামান্য হোক্—এক পক্ষে বসিরের দুরন্ত জিদ, অপর পক্ষে চিতলমারির জেলেদের একগুয়েমি। তাই বড় এক পশলা হাতাহাতি হয়ে যাচ্ছিল এবং হাটুরে কিল একবার সুরু হলে আর থামতে চায় না। সেদিন বসিরকে বাঁচাতে আমার পিঠেও দু-চার ঘা না পড়েছিল এমন নয়; তবু বসির রাগে ফুঁসতে লাগল। 'হালাগো জান্ খতম করমু, তয় আমার নাম বসির স্যাক্'—বলে

গর্জাতে লাগল সে। আমি তাকে ধরে জোর করে নিয়ে গেলাম হাটের বাইরে বড় বাদাম গাছটার তলায়।

বসির একটু শান্ত হলে দুজনে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম।

সেই বসির,—বসিরুদ্দিন শেখ, আমার ছোটবেলার দোস্ত। কিন্তু একি তাজ্জব ব্যাপার! সে কি আলিবাবার মত কোন গুপ্তধন চিচিং ফাঁক করে এসেছে নাকি! আমি শহরে একটা গ্রামোফোনের দোকানে কাজ করি। বসির তা জানেও না। কতদিন দেখা শোনা নেই। আজ দেখি সহসা সেই দোকানে এসে হাজির। না, আমার কাছে আসেনি। আমি যে সেই দোকানে কাজ করি তাও সে জানে না। এসেছে কলের গান কিনতে, রেকর্ড কিনতে, পিন কিনতে। মিঞা ভাইদের হাতে টাকা এলে এসব বস্তু চাইই, তাই সে এই সব নিতান্ত শখের জিনিস খরিদ করতে এসেছে।

এসে দাঁড়াল একেবারে কাউন্টার ঘেসে। কি চমৎকার খোসবু বেরুচ্ছে বসিরের গা থেকে। পরণে মাথা সরু চকচকে পাম্পশু, তার উপর লুটিয়ে পড়েছে সফেদ রং-এর পায়জামার ঢোলা কাপড়ের বহর। গায়ে জাফরান রং-এর কামিজ, দস্তুরমত সূতার কাজ করা। তার উপরে দামী মির্জাই। মাথায় ফেজ।

বসির বাজিয়ে শুনলে কলের গান, অগুনতি রেকর্ড, তারপর কোমর থেকে গেজে খুঁলে করকরে দশটাকার একগাদা নোট বের করে জিনিস পত্রের দাম মেটালে। আমি দূরে বসে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। ঐ দোকানেরই নগণ্য কর্মচারী বলে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা হল। বসির সেদিন বেরিয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম—যাক্, মুখোমুখি দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

কিন্তু দুচার দিন পরেই দেখা হয়ে গেল। স্টীমার ঘাটে গিয়েছি কলকাতা থেকে পাঠানো মালের বাক্স ছাড় করাতে, দেখি জেটির কাছে বসির দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুকছে। ভারি কৌতূহল হল। যতদূর জানতাম, বসির তার বাপের খামার দেখা ছাড়া আর কোন কাজ করত না। তার বাপ অবশ্য বেঁচে নেই, হাল-ক্ষেত-খামারের সে-ই

এখন মালিক। কিন্তু তাতে এত পয়সা পাওয়া যায় না। বসির বিয়ে করেছিল, বোধহয় শ্বশুরের বিষয় আসয় কিছু পেয়েছে—এ সেই পয়সা। না কি, বসিরও এটা-সেটার চোরাকারবার সুরু করেছে? শোনাই যাক্ না!

গেলাম বসিরের কাছে। আমায় দেখে চিন্‌লে, একটা বিড়ি দিয়ে খাতিরও জানালে।

আমি বসিরের নসিব খোলার জন্য খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালাম। শুনে বসির কোথায় খুসি হবে, তা নয় মুখখানা গোমড়া করে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লে—খোদাতাল্লার মনে যে এই ছেল তা যদি তেহন জানতাম তয় কোন হালা হেমন কম্ম কত্তি রাজি অয়।

ক্যামন কম্ম?—জিজ্ঞাসা না করে পারিনে। ছোটবেলার দোস্ত সে, যাকে হাটুরে কিল থেকে বাঁচাতে নিজের পিঠেও কিল খেয়েছি।

বসির বল্লে—তয় কই শোন্।

বাপ্‌জানের ইচ্ছেয় সাদি করিল্লাম ছয়েদপুরের ছায়েম মিঞার বিটীকে। বাপের এক মাইয়া, পাবে থোবে যা আছে সবই, এ তো জানা কথা। হলও তাই। ফতিমাকে নিয়ে ঘর করলাম পাঁচ বছর। বছর দুই আগে ফতির বাপের এন্তেকাল ফরমাইল। মা মাটি পাইছে অনেক আগে। বাপটা ছেল ভালোমানুষ, আর নিকা সাদির ঝঞ্ঝাট করেনি। তাই স্থাবর-অস্থাবর বিষয় আসয় যা কিছু বুড়োমিঞার ছেল, সব আমার কজ্জায় আসলো। আমি সেই ধানপান আদায়ে যাই, ফতির চাচার বাড়ি উঠি। বুড়ো হাড় বজ্জাত, আগে মতলব বোঝবার পারিনি। খুব খাতির, যত্ন-আত্তি পাই। ভাবি, হাজার হোক্, ফতির চাচা, না করবেই বা ক্যান্,—হলামই না হয় হকের ভাগ্‌দার। শ্যাষে একদিন বুড়ো খোলাখুলিই কয়—বসির, বাপু তোমারে কওনও যায় না, সওনও যায় না। পাঁচ পাঁচটা বচ্ছর সাদি করলা, এড্ডা ছাওয়াল-পাওয়াল হল না। তুমি ফতিরে তালাক ছ্যাও, আমি আট্টা ভালো মাইয়া দেইখ্যা তোমার সাদি দিই।

আমি রাজি হইনে। ফতি, মনে করো, আমার ঘরভরা বউ। শুধ্যা শুধ্যা তারে তালাক্ দিমু ক্যান্?

বুড়ো তউ ঘ্যানর ঘ্যানর করে। শ্যাষে না মনের কথা খুইলাই কয়। ফতিরে তালাক দিলি সে আমায় হাজার টাহা নগদ দিতি কড়ার করে। তার লাভ? লাভ আছে ছাড়া কি বিনা লাভে হাড় কিপ্টে হাজার তঙ্কা খসাতে চায়। ফতিরে আমি তালাক দিলি বুড়ো তার ছোট ছাওয়ালের সঙ্গে নিকা করাইয়া ঘরের মাইয়া ঘরে ফিরাইয়া নেওনের রাস্তা পায়। তার মানে হইল, ফতির বাপের বিষয়-আসয় স্থাবর-অস্থাবর আবার বুড়োর কব্জায় যায়।

আমি শুনতে শুনতে উৎসাহিত হয়ে উঠি, বলে ফেলি, আহা, কি চমৎকার প্ল্যান! তুই রাজি হলি তাতে?

বসির বল্লে—শোন কথা, এ কেউ রাজি অয়? ঘরভরা বউ কেউ টাহার লোভে ছাইড়া ছ্যায়। বিশেষ আমার নিজির খেতখামারও যে এহেবারে নেই, তাও তো না।

আমি কিন্তু কথাটা কলাম হারামজাদিরে। ফতিউ শুইন্যা রাইগ্যা কাই! কয়,—চাচা তো না হাড়িচাচা, মুকে থুক্ দিয়া দিলা না ক্যান্? ঝাটু মারলা না ক্যান্? হমন চাচার হাতনে যদি আর মাড়াও তবে তোমার স্যাক্ নাম ঘুচাইয়া দিমু।

আমি আরো ঠাট্টা কইরা কই—ক্যান্, তোমার চাচার ছোট্ট ছাওয়ালডা এহোন বেশ ডাসো অইচো গ! ইয়া বড় জোয়ান্ মরদ অইচে গ। যাও না ক্যান্, তার কাছে, সুখডা কম্ কিসে?

হাসি-মসকরার মধ্যি কথাডা কিছুদিন চাপা পড়ছেল। কিসে না জানি কথাডা আবার ওঠলো। নানা কথার পর ফতি কইলো—বুড়োর কাছথে যদি ছুইডি হাজার টাহা আদায় কত্তে পারো, তবে নয় তালাক-তালাক ভবটা ছ্যাহানো যায়।

আমাগো দুজনার মধ্যে শল্লা হল। বুড়োমিঞা নিজে যেমন ঠক্, তার কাছেথে টাহা নিয়া জোতজমি করোনে কোন ক্ষয় ক্ষতি

নেই। ফতি নিজিও জানত কিনা, তার চাচার প্যাটরায় যত টাহা তার বেশীর ভাগ ফতির বাপরে ঠহানো টাহা। তাই ঠিক করা গেল—আমি ফতিরে তালাক দিয়ে টাহা নেব, ফতি কিছু দিন পরে নিজিই ফিরে আসপে।

করলামও তাই। কলাম গিয়া বুড়োমিঞারে। সে তো আহ্লাদে আটখানা। তয় দুই হাজার দিতি পারল না। কুড়োয়ে বাড়োয়ে বারো শ আনলো, আরও শ তিনেক ধান পাকলি দেবে কথা হল। ফতি তার চাচার কাছে গেল।

এই পর্যন্ত বলে বসির ফোঁস্ করে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। আমি ভাবলাম, ফতি নিশ্চয় আর ফেরেনি, তাই সমবেদনার সুরে বল্লাম—নিকে করে রয়ে গেল বুঝি চাচাতো ভাইয়ের কাছে?

বসির বল্লে—না; নিকে হল, আবার কড়ার মতো কয় মাসের মাথায় ফতি ফিরেও আসলো। তেহন ধান পাকছে। ফতির বাপের জমির ধান আমি জোর করে কাটালাম। বুড়ো মিঞা আর তার ছাওয়ালেরা কাইজা করতে আসলো। মাথা ফাইট্যা ফিরা যাইয়া মামলা করলো। ফতি আমার দিক্। সে সব সাফ অস্বীকার করলো। তালাক্ হয়নি, নিকেও হয়নি। মা-বাপ নেই, চাচার বাড়ি বেড়াবার লাইগা দুচার দিন কোন্ মাইয়া না যায়? মামলা টেকল না। জমিজমা মায় ফতি সব ফিরা পাইলাম।

এই পজ্জন্ত লাভেসুভে চললো মন্দ না। কিন্তু দুদিন না যাইতেই ব্যাপারডা মোচড় খাইয়া দাঁড়াল। ফতির শরীল খারাপ। খাটাখাটনি গেচে, মামলা-মোকদ্দমা গেচে, ভাবলাম তাই। শ্যাষে দেহি—না, আর এক লতুন ফ্যাসাদ। ব্যাপারডা আমার বেশী খারাপ লাগেনি, বরং যেন বাড়তি মুনাফা মনে করছেলাম। কিন্তু বেইক্যা বসলো ফতিমা। কয়—তুমি পাঁছ বচ্ছরে যা পারো নাই,

সে পাঁচ দিনে তাই করছে। তেনার জন্যি ফতির তাই থাইক্যা থাইক্যা শোক ওথলাচ্ছে। এ শোহের আমি কি করি কও।

উত্তর দেওয়া সহজ নয়, বরং পরিস্থিতিটা বেশ জটিল বলেই মনে হল আমার। আমি চুপ করে আছি দেখে বসির নিজেই বলতে সুরু করলে—ফতিকে ভোলাতে সহরে আন্‌ছি, এডা ওডা দেহাচ্ছি। কলের গান কিন্‌ছি, রেকড কিন্‌ছি, নিজে ফুল লবাবটি সাজছি, তবু ফতির মনের লাগাল পাই কই! থাইক্যা থাইক্যা কান্দে। যে নিকা অস্বেকার করছে সেহানে ফেরনেরই বা রাস্তা কই? ইদিক আবার মনেও পেরবোধ মানে না।

চাচাশ্বশুরের কাছে পাওয়া হাজার বারোশ টাকা ফুকে দিয়েও বসির যদি তার আগের ফতিকে ফিরিয়ে পায় সে তার বিহিত চেষ্টা করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের মন তো টাকায় কেনা যায় না। চাচাকে ঠকাতে গিয়ে কখন কোন্‌ রন্ধ্র পথে নিজেই যে ঠকেছে ফতিমা নিজেও তা জানে না। কিম্বা এ তার ঠকা নয়,—সে যে মা হতে চলেছে!

খাঁ সাহেব

খাঁ সাহেবের সঙ্গে আপনাদেরও হয়ত সাক্ষাৎ হয়েচে। কেউ তাঁকে দেখেছেন দুর্গাপুরের দরবারে, কেউ দেখেছেন জোড়াসাঁকোর জলসাঘরে। সেখানে তাঁকে দেখে তার ভেতরের মানুষটিকে চেনা যায় না। সেখানে শুধু তাঁর বাইরের পোশাকটাই পৃথক নয়, সেখানে মানুষটাও আলাদা। সে মানুষটি তখন এক অবাস্তব অতীন্দ্রিয় লোকের অধিবাসী। সুরসমুদ্রে ডুব দিয়েছেন তিনি। নিজেও তিনি কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না তাঁর সুরের নেশায় বন্ধ চোখে, আর কেউ তাঁকে দেখছে কিনা সে অনুভূতিও নেই তাঁর। সেতারের তারে তারে অবলীলায় ওঠা-নামা করছে বাম হাতের আঙ্গুল গুলি। ডান হাতটা মৃদু মৃদু কম্পনে বার বার কি ব্যঞ্জনা ধ্বনিত করে তুলছে তাওতো চোখ দিয়ে দেখবার নয়, চোখ বুজে সারা মন-প্রাণ দিয়ে শুধু অনুভব করবার বস্তু। ওই অখণ্ড অপরিমেয় সুরপ্রবাহে ভাসমান সুরস্রষ্টা, ভাসমান তার শ্রোতা—যেন সুর-লহরীর দোলায় দোলায় মগ্নচৈতন্য সকলেই আবহমান কাল ধরে ভেসে চলেছেন।

কিন্তু খাঁ সাহেবের সেতারও এক সময় থামে, তাঁর মত মানুষেরও সুরের নেশা কমে আসে, আবার তবিয়তে হোস হয়, নিজের মধ্যে ফিরে আসেন তিনি,—বেলাশেষে কুলায় ফেরা পাখীর মতো জলসা শেষে ডেরায় ফিরবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মেরজাইটা এঁটে পরেন, তাজটা মাথায় ঘুরিয়ে বসান, তারপর রাজপথে যখন বেরিয়ে আসেন তখন নিশুতি রাত। ওয়েলার ঘোড়ার খুরে পাড়া কাঁপিয়ে রাজা বাহাদুরের ব্রুহামগাড়ি খাঁ সাহেবকে পৌছে দিতে চলে

যায়। তানপুরা বাদক আসফাক আলি আর তবলচি সরিফ মিঞাও তার সঙ্গে আসেন। পথে তাঁরা একে একে নেমে যান, তারপর গাড়ি এসে থামে মেছুয়া-বাজারের গলির মুখে। কোচোয়ান নেমে আসে। খাঁ সাহেব গাড়ির দোলায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁকে জাগিয়ে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে আসে তাঁর ডেরায়। কোন দিন বা বিছানা করে খটিয়ায় শুইয়েই দিয়ে আসে। সবাই শ্রদ্ধা করে খাঁ সাহেবকে।

অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে যখন জেগে ওঠেন খাঁ সাহেব, তখন তিনি ভিন্ন মানুষ। রাতের সেই খানদানি বেশ খুলে রেখেছেন, গায়ে নেই মলমল, মাথায় নেই তাজ। সংসারে তাঁর কেউ নেই, তবু এখানে একা একা দারুণ অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। কলকাতায় জানপচান বেশি নেই। তিনি গোয়ালিয়র ঘরানার একজন সিদ্ধ সাধক, বাংলাদেশে এর আগে আসেননি কোনদিন। মেছুয়াবাজারে যাদের আশ্রয়ে এসে উঠেছেন তারা সবাই মেহনতি মানুষ, খাঁ সাহেবের পরিচিত দু'চার জন আছে, কিন্তু তারা খাঁ সাহেবের উপযুক্ত মুজরা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে না। খাঁ সাহেব বিশেষ বিব্রত বোধ করেন। খাঁ সাহেব যেচে যাবেনই বা কার কাছে? জোড়াসাঁকোর মুজরায় বাজিয়ে এসে ভাবছেন আবার কোথায় কবে কিছু জুটবে।

এমন সময় দুর্গাপুরের রাজবাড়িতে পাকাপাকি কাজের একটা প্রস্তাব এসে গেল। যোগাযোগটা ঘটল একজন চিত্রকরের মাধ্যমে এবং তাও নিতান্ত আকস্মিকভাবে।

রাজাবাজারে দাওয়াত সেরে খাঁ সাহেব তাঁর ঘরে ফিরছিলেন মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ধরে। তখনও রাস্তাটির নাম কেশব সেন স্ট্রীট হয়নি। চেপে জল এসে পড়ায় একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বারান্দাতেও জলের ছাট আসচে। আর কোথায় সরে দাঁড়ানো যায় ভাবছেন খাঁ সাহেব, এমন সময় গৃহস্বামী দরজা খুলে তাঁকে ভিতরে ডাকতে বললেন। একটি তরুণ যুবক খাঁ সাহেবকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে খাঁ সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। একজন বয়স্ক ব্রাহ্মণ একটি ইজেলের সুমুখে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছেন। তাঁর বাম হাতে রং-এর প্যালেট, ডান হাতে তুলি। চশমার ফাঁক দিয়ে আগন্তুককে দেখে তিনি প্যালেট-তুলি নামালেন, সাদর আহ্বান জানালেন খাঁ সায়েবকে—আইয়ে খাঁ সাব, অন্দর আইয়ে।

এই আন্তরিক আহ্বানে খাঁ সাহেব আর ইতস্তত না করে ভিতরে এগিয়ে গেলেন। ঘরের চারিটি দেওয়ালে অজস্র ছবি টাঙ্গানো। উজ্জ্বল আলোকে একসঙ্গে এতগুলি ছবি দেখে খাঁ সাহেবের মনে হল—তিনি যেন কোথাও বহু জনসমাগমের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু তার বিস্ময়ের আরও কিছু বাকি ছিল। শিল্পী ইজেলে যে ছবিখানি আঁকছিলেন সেদিকে চোখ পড়তেই খাঁ সাহেব আর চোখ ফেরাতে পারেন না। সম্রাট আকবরের দরবারে তানসেন গান গাইছেন—ছবিতে তারই মহিমময় রূপ ফুটে উঠেছে।

খাঁ সাহেব সুরের পূজারী। যখন সেনী ঘরানার রাগরাগিণীর আলাপে মন ডুবে যায় তখন কতদিন তিনি কল্পনায় বাদশাজাদার খাস দরবারে গিয়েছেন, চুপি চুপি বসেছেন পিছনের সারির মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে। অদূরেই তানসেন সুরলহরী বিস্তার করছেন। সে সুরের বুঝি তুলনা নেই। খাঁ সাহেব রোমাঞ্চিত কলেবরে শুনেছেন সে গান।

এই কল্পনায় খাঁ সাহেব কতদিন মশগুল হয়ে যেতেন। নিজে সেতারের বুকে তানসেনকে অনুসরণ করেছেন, কাউকে ডেকে দেখাতে পারেননি তাঁর কল্পনার ছবিখানি। আজ তার সুমুখে দাঁড়িয়ে আর এক কলাকার। তিনি রঙের পূজারী, তিনি রূপের সাধনায় বিভোর হয়ে আছেন। তানসেন যেন ধরা দিয়েছেন এক অপরিমেয় আনন্দময় রূপে। প্রতিটি রেখায়, বর্ণে, রূপলালিত্যে, ভারত সম্রাটের বৃহৎ দরবারেয় রূপ-বৈভব বিকশিত হয়ে উঠেছে। খাঁ সাহেব শ্রদ্ধায় বিনত হয়ে চিত্রকরকে সেলাম জানালেন, আন্তরিক অভিনন্দন

জানালেন তাঁর অপূর্ব চিত্র-রচনার জন্য, বলে উঠলেন—বহুৎ আচ্ছা, বহুত আচ্ছা আপনার হাত।

শিল্পীর তুলি থেমে গিয়েছিল, তিনিও একদৃষ্টিতে দেখছিলেন খাঁ সাহেবকে। কোথাও যেন দেখেছেন, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছেন না। ঠিক ওই দাড়ি, ওই মুখ—কিন্তু বুঝি অন্য বেশে এবং অন্য পরিবেশে দেখেছেন কোথাও।

খাঁ সাহেব হাত তুলে সেলাম জানাবার ভঙ্গির মধ্যেই যেন অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকালো, শিল্পীর চোখে পড়ল খাঁ সাহেবের আঙুলে পরা মেরজাবের ঝিলিক। একটা নয়, এক জোড়া মেরজাব আংটির মত তাঁর আঙুলে গেঁথে আছে। শিল্পীর মনে পড়ে গেল জোড়াসাঁকোর জলসাঘরের দৃশ্যটি। বিরাট হলঘরে ধবধবে সাদা ফরাস পাতা। ঝাড় লণ্ঠন জ্বলছে, আতর গোলাপজলের খোসবাই বাতাসে ভাসছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে শিল্পীও আসন নিয়েছেন। গোয়ালিয়র থেকে এসেছেন কোন্ বড় সেতারী—তাঁর বাজনা শুনছেন সবাই তন্ময় হয়ে। সেতারে তাঁর আলাপ শুনে মহারাজার মুখে হাসি ফুটেছে, মুজরা দেওয়া সার্থক মনে করেছেন বুঝি। সভাসদেরাও বিস্ময়ে আনন্দে আবিষ্ট হয়ে আছেন।

মহারাজার জলসাঘর উজ্জ্বল করা সেই ওস্তাদ আজ চিত্রকরের ক্ষুদ্র আস্তানায়! নিজের সৌভাগ্যে বিশ্বাস হয় না শিল্পীর। খাঁ সাহেবের কথার সূত্র ধরেই জবাব দেন—আপনার হাত যে আরও তাজ্জব খাঁ সাহেব। আপনি সুরের যাদুকর।

খাঁ সাহেব অবাক হয়ে যান। নগ্নগাত্রে দণ্ডায়মান ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খাঁ সাহেবকে চিনলেন কেমন করে? তবে কি জোড়াসাঁকোর মুজরাতে ইনিও নিমন্ত্রিত ছিলেন? অসম্ভব কি। রাজরাজড়ার বাড়িতে সব কলাবিদেরইতো সমান আদর।

শিল্পী পরম সমাদরে বসালেন খাঁ সাহেবকে, জলযোগে পরিতুষ্ট করলেন, পান আনালেন, জর্দা কিমাম আনালেন, তারপর জোড়াসাঁকোর আসরের বিষয়ে খাঁ সাহেবের বাজনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে

অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন। খাঁ সাহেব দেখলেন—শুধু রূপ নয়, রঙ নয়, সুরের রাজ্যেও স্বচ্ছন্দ বিচরণে অভ্যস্ত এই শিল্পী। মনে মনে তাঁকে দোস্ত বলে মেনে নিলেন।

এরপর শিল্পীর চিত্রশালায় ওস্তাদ খাঁ সাহেব সময় পেলেই আসেন। বলা বাহুল্য, কথাবার্তার মধ্যে মুজরার খোঁজ খবরও আলোচিত হয়। দুর্গাপুরের রাজবাড়িতে স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করে এসে শিল্পী যেদিন খাঁ সাহেবকে সে কথা জানালেন, খাঁ সাহেবের তখন বেশ কিছুদিন মুজরা অভাবে খুব অসুবিধায় দিন চলছে। শিল্পী আশা করেছিলেন, সংবাদটি শুনে খাঁ সাহেব নিশ্চয় খুব খুশি হবেন, কিন্তু তিনি খুশি হওয়া দূরে থাক্, কোন রাজবাড়ির বারো মাসের বাঁধা মাইনেটাও তার বিশেষ মনঃপুত হল না। তিনি বললেন—রাজবাড়ি মুজরা পেলেই তিনি যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করবেন, স্থায়ী ভাবে কোথাও থাকতে আর তিনি ভরসা পান না।

শিল্পী বল্লেন—কেন, ছিলেন কি কোনও রাজবাড়ি ?

খাঁ সাহেব বিষণ্ণ হাসি দিয়ে কথাটা চাপা দিতে চাইলেন, কিন্তু শিল্পী শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন। খাঁ সাহেব বললেন—

জব্বলপুরের বাঙ্গালী জমিদার 'রাজাসাহেব' জান্‌কিজীবন বাবুর নাম হিন্দোস্তান মে সব কোই জানে। এমন রইস আদমী, ফিন খুদ কলাকার দুর্লভ। বীণ আউর সুরবাহারে বড় ঘরানার ওস্তাদ সাকরেদ। যেমন বনেদি বড়লোক, তেমনি বনেদি চালচলন। লখনৌ, দেহলী, আগ্রে, প্রয়াগ সব কোই দিকে জানপচান আছে, রাজাসাহেবের বাড়ি বড় বড় বাঈজীরা হরবকত মুজরা পায়। সবার মুখে 'রাজাসাহেবে'র জয়গান। খাঁ সাহেব ছিলেন সেই রাজাসাহেবের খাস দরবারের সেতারী। রাজাসাহেব শিকারে যান, সঙ্গে লোকলস্কর, হাতী, তাঁবু, বাঈজী—কত কি যায়। কিন্তু তবু খাঁ সাহেব সঙ্গে না থাকলে রাজাসাহেবের চলে না। শিকার নিয়ে দিন যায়—রাত হয়, বাঈজীদের গানবাজনাও এক সময় শেষ হয় কিন্তু খাঁ

সাহেবের বাজনা সব শেষে না শুনলে রাজাসাহেব স্বস্তি পান না। খাঁ সাহেব তাই রাজা সাহেবের পেয়ারের লোক।

খাঁ সাহেব থাকেনও আরামে। রাজবাড়ির নজদিগ্, আলাগ্ এক কোঠিতে থাকেন তিনি। তাঁর খাস খিদমতগার দুইজন। রাজবাড়ি থেকে খানাপিনা আসে। খাঁ সাহেব খুব পসন্ করেন সে খানা। খাঁটি ঘিউয়ে তৈরী চপাটি, ভাজি। ঘন দুধ, দহি, মাখন। কোথায় লাগে এর কাছে গোস্ত কাবাব, সিরাজি। জলপান আসে বাংলা মুলুকের ময়রার হাতে ছানা চিনি দিয়ে তৈরী। টাটকা ছানারও কি সোয়াদ, কি তার পোষ্টাই। রাজাবাহাদুর তার জন্য দুই সের দুধ বাড়তি বরাদ্দ করেছিলেন। অভ্যাসে সেটা নেশায় দাঁড়িয়েছে। মোট কথা, গব্যরসের নেশাও যে একটা প্রবল নেশা এটা খাঁ সাহেব বুঝেছেন হাড়ে হাড়ে।

সেই নেশার বস্তু ছেড়ে, রাজবাড়ির পরম সমাদর ও নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তবে খাঁ সাহেব চলে এলেন কেন? শিল্পী ভাবলেন মনে মনে। খাঁ সাহেব নিজেই বল্লেন তারও কারণ।

রইস আর সৌখিন রাজাসাহেব একবার বাংলা মুল্লকে এলেন। আত্মীয়স্বজন সবাই তো এদিকেই। রাজাসাহেব অনেক রোজ আর ফিরবার নামটি করেন না। খাঁ সাহেবের তাতে কোন অসুবিধা ছিল না। তাঁর সব কিছুর বরাদ্দ ঠিকই ছিল। রাজাবাহাদুর ফিরলেন তিন মাহিনার মাথায়—একেবারে ভোল পালটিয়ে। তখন তার গলায় মালা, হাতে জপের থলে, একেবারে বৈষ্ণব। রাজাসাহেব আর তাঞ্জাম চড়েন না, শিকারে যান না, বাঈজীরা মুজরা পায় না, এমনকি এত যে পেয়ারের খাঁ সাহেব,—তাঁরও ডাক পড়ে না।

খাঁ সাহেব বুঝলেন—রাজাসাহেবের কাছে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই বিদায় নিতে গেলেন। রাজাসাহেব শুনে বুঝি কেঁদেই ফেললেন। খাঁ সাহেবের স্বর্গীয় সঙ্গীত, বেহেস্ত-এর হুরী পরী নামে খাঁ সাহেবের সেতারের তারে ঝঙ্কার তুললে। জীবনের

আধা আধি দুই দোস্ত একসঙ্গে কাটিয়েছেন, বাকি দিন কটাও তেমনি কাটবে। কেন এই বয়সে খাঁ সাহেব আবার মুজরা খুঁজে বেড়াবেন?

রাজা সাহেবের অনুরোধ খাঁ সাহেব এড়াতে পারলেন না। তা ছাড়া দুধ-ঘিউ-দহি-ছানার টানও যে একটুখানি ছিল, সে কথা একেবারে অস্বীকারই বা করা যায় কেমন করে?

দিন যাচ্ছিল একভাবে। খাঁ সাহেব আপন মনে সুরসাধনা করেন। রাজাসাহেব মাঝে মাঝে শুনতেও আসেন। ইদিকে দেখতে দেখতে রাজবাড়ির ভিতর ইয়া বড় এক মন্দির তৈরী হয়ে গেল। খুব ধুমধাম করে তাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হল। উৎসব শেষে রাজাসাহেব দোস্তকে স্মরণ করলেন। খুশী মনে খাঁ সাহেব রাজা বাহাদুরকে সেতার শোনাতে গেলেন। সেদিন আসর ভাঙ্গলে রাজাসাহেব বললেন—এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত দেবতার অর্চনাতেই দেওয়ার যোগ্য। বহুৎ বিনয় করে রাজাসাহেব অনুরোধ করলেন, রোজ আরতির পরে এই বাজনা শোনাতে হবে তাঁর ঠাকুরকে।

মনিব নন শুধু, দোস্ত বলেই ডাকেন রাজা সাহেব। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে কসুর করলেন না খাঁ সাহেব। কিন্তু তাঁর বাজনার উৎসাহে কমতি পড়তে লাগল। শেষে ভয় হল, সারা জীবন সুর সাধনা করে শেষ জীবনে কি তিনি এমন অসহায় হয়ে পড়বেন? আবার মোকাবিলা করতে চাইলেন রাজা সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু এমনই একটা অবস্থার সৃষ্টি হল যে মনে মনে খাঁ সাহেব যা কিছু মক্‌সো করে আসেন এবং যতবারই বলতে যান, জবানে তা কিছুতেই ফোটে না। রাজা বাহাদুরও দেখা হলেই এমন ব্যবহার করেন যেন খাঁ সাহেব না থাকলে তাঁর এক দণ্ডও কাটবে না। আর দুধ-ঘিউ-এর বরাদ্দের কিছুমাত্র ঘাটতি পড়েনি।

শেষ ঘটনাটা যা ঘটল তা আর খাঁ সাহেব সইতে পারলেন না। দুধ-ঘিউ-এর নেশাও আর তাঁকে বাঁধতে পারল না। তিনি রাজা সাহেবকে কিছু না বলেই একা অজানা শহর কলকাতায় চলে এসেছেন।

রাজা সাহেবের মন্দিরে গান শোনাবার জন্য একটি দল গেল

বাংলা মুল্লুক হতে। তাদের সে গান রাজা সাহেব খুবই তারিফ করতে লাগলেন, খাঁ সাহেব কিন্তু কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। করুণ মধুর সেই গানের সুর তাঁর কাছে নিতান্ত বেসুরো বোধ হতে লাগল। একদিন তাই কাউকেই কিছু না জানিয়ে খাঁ সাহেব রাজবাড়ি ত্যাগ করলেন।

আর এই যে দুর্গাপুরের রাজবাড়িতে থাকবার প্রস্তাব তিনি সুস্থ মনে নিতে পারছেন না তাও ওই একই ভয়ে। যেখানে তার সুরসাধনার ব্যাঘাত ঘটবে, বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে তেমন কোন ঠাঁই দুধ-ঘিউ-দহি-ছানা বোঝাই থাকলেও তিনি যাবেন না সেখানে।

শিল্পী তন্ময় হয়ে শুনছিলেন খাঁ সাহেবের কাহিনী, দু'জনে কেউ লক্ষ্য করেননি স্বয়ং দুর্গাপুরের মহারাজকুমার কখন এসে আসন গ্রহণ করেছেন। ওস্তাদজীর কথা শেষ হলে তিনিই প্রথম কথা বললেন। মহারাজকুমার আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমাকে মহারাজ বীরেন্দ্রকেশরী গাড়ি দিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। আজ আপনাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য মহারাজ বিশেষ আয়োজন করেছেন, শহরের তাবৎ সমঝদারেরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন আপনার সেতার শুনবেন বলে।

শিল্পী বললেন—খাঁ সাহেব, দুর্গাপুরের রাজবাড়ি আমাদের দেশে এক মহান খানদানি ঘর। মহারাজা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে গান বাজনার সমঝদার, খোদ গাইয়ে-বাজিয়ে। সারা হিন্দুস্তানের তাবৎ ওস্তাদ মহারাজের প্রাসাদে পায়ের ধূলো দিয়ে থাকেন। আপনি যদি না যান সে 'বহোৎ আফসোস কি বাৎ' হবে। আপনি মুজরা নিন। ঘর পসন্ না হলে আপনাকে দুধ-ঘিউ-দহি-ছানা দিয়েও তো কেউ ধরে রাখতে পারে না।

খাঁ সাহেব প্রসন্ন মনে হাসলেন—'ওহি বাৎ ছোড় দিজিয়ে সাব।' আপনিও যাবেন তো?

শিল্পী উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—ওস্তাদজী গেলে আর সাকরেদ যাবে না? দাঁড়ান ব্রাহ্মণীকেও নিয়ে আসি।

দ্রুতপদে শিল্পী বাড়ির ভিতর চলে গেলেন।

সৈনিক

ঝগড়াটা বেধেছিল একটা নিমন্ত্রণ নিয়ে। বড়লোকের বাড়ি শ্রাদ্ধ, সেখানে যে আজকাল খাওয়া দাওয়ার পাট নেই, বড়োজোর একগাছা বেল ফুলের সরু মালা দেয়, তারপর মৃতের প্রীত্যর্থে গীত লীলাকীর্তন শুনে ফিরে আসতে হয়—একথা সুষমা জানতো না। তাই সুরেশ যখন নিমন্ত্রণে গেলেও ফিরে ঘরেই এসে খাবে বল্লে তখনই সুষমা চটে গেল।

আফিসে ষ্ট্রাইক চল্‌ছে। সংসারে টানাটানির একশেষ। তাতেই মাথা গরম হয়ে আছে সুষমার। তাতে আবার ছোট মেয়েটির ক'দিন থেকে জ্বর, ডাক্তারে সন্দেহ করছে ডিপথিরিয়া না হয়। বড় ছেলে আর মেয়ে এই যে দিনের পর দিন 'হলুই' গেয়ে বেড়াচ্ছে, সুরেশের অন্যদিন না হয় সময় হয় না, এখন তো অফিস বন্ধ। এখন কি সে পারে না ছেলে মেয়ে দু'টিকে নিয়ে একটু বসতে।

সুরেশ ওদের নিয়ে একটু বসেছিল, কিন্তু আটটায় শ্রাদ্ধ বাসরে যাওয়ার নিমন্ত্রণ, আটটা তো বাজে। জ্যামিতির জট ছাড়াতে বসলে বা ইংরাজির পাঁজিপুঁথি আওড়াতে থাকলে দশটার আগে শেষ হবে না, সে তাই ছেলে মেয়েদের পড়তে বলে নিজে উঠতে যাচ্ছিল। সুষমার চোখে পড়েই কেলেঙ্কারী।

'কাজ তো করেন প্রুফ রীডারী, তা অত বড় লোকের বাড়ি নেমন্তন্নে যাওয়া কেন?'—সুষমা শোনাতে ছাড়ে না। খেটে খেটে, মেয়ের অসুখে রাত জেগে, অভাবে অনটনে তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে।

যাঁর শ্রাদ্ধ তিনি সুরেশকে ভারি ভালবাসতেন। সুরেশ তাঁর প্রেসেই প্রথম হাতে খড়ি দেয়। পরে তার উন্নতির জন্যই তিনি সুরেশকে খবরের কাগজে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। সুরেশ নামে প্রুফ রীডার, আসলে সে সম্পাদকীয় বিভাগেই কাজ করে, রবিবারের কাগজে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখে। বই লিখেছে তিনখানি, তেমন বিক্রি হয় না। প্রকাশকেরাও আমল দিতে চায় না। তবে সে দু তিন বার পূর্বের মনিব শম্ভুনাথ বাবুর জীবনী লিখেছিল,—কি করে তিনি পঞ্চাশ টাকার কেরাণী হতে পঞ্চাশ লাখ টাকার মালিক হয়ে ছিলেন তারই বিচিত্র ও ঘটনাবহুল কাহিনী সে জীবনীর আকারে লিখেছিল। শম্ভুনাথবাবু ও তার ছেলেরা তাতে খুশি হবেন তা আর আশ্চর্য কি? আজ শম্ভুনাথ বাবুর শ্রাদ্ধেও তাই সে সামান্য ব্যক্তি হয়েও নিমন্ত্রণ পেয়েছে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সাংবাদিক সবাই উপস্থিত হবেন, সুরেশ না গেলেও কেউ লক্ষ্য করবে না, কিন্তু গেলে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো। আর এই ধর্মঘট চলতি অবস্থায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ রাখা একান্ত দরকার—মাস গেলেই যখন মাইনে আসবে না।

কিন্তু সুষমা ও সব বুঝতেই চায় না, সে বলে অমন বাজে নিমন্ত্রণে না গিয়ে ততক্ষণে ছেলেমেয়েকে পড়ালে কাজ হবে।

স্ত্রীকে বোঝাবার জন্যে সুরেশ বল্লে—পুরোনো মনিববাড়ি, এই দুঃখের সময় গেলে ছেলেদের সঙ্গে আলাপটা আবার ঝালিয়ে নেওয়া হত। পরে অন্তত এই ধর্মঘট চলা কালেও যদি একটা পার্ট টাইম প্রুফ রীডারী পাওয়া যেত, খুবই উপকার হত কিন্তু।

সুষমা ঝেঁঝে উঠল। সব বাজে কথা। পার্ট টাইম কাজ নেই সে তো শম্ভুবাবু সেদিনও বলে গেছেন, আর আজ তার বাড়ি যাওয়া মাত্র তার ছেলেরা পায়ে ধরে সেধে নেবে। ওঃ, কি আমার কর্মিষ্ঠ পুরুষরে!

অভিমানে চক্ চক্ করে ওঠে সুরেশের চোখ। ওর মেয়েটি অনুভব করে—মা বড় ব্যথা দিয়েছে বাবাকে। সে বাবার কোল

ঘেঁসে বসে। তার এম-এ পাশ বাবা, তার সাহিত্যিক বাবা, কারো বাবার থেকে সে খারাপ নয়। আফিসে ধর্মঘট চলছে, তাই বাবা টাকা আনতে পারে না। মা সেজন্য চটে উঠলে মেয়ের মনটা কেন জানি বাবার দিকে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ঝুনু বলে—তুমি নিমন্ত্রণে যাও বাবা। এসে দেখো, আমরা সব অঙ্ক করে রাখবো।

সুরেশ ওঠে না, গুম হয়ে বসে থাকে। সত্যি তো, সে গরীব, অত বড়ো লোকের বাড়ি সে নিমন্ত্রণে যাবে কেন? গেলে মানাবেই বা কেন?

প্রত্যহ ইউনিয়ন অফিসে যাওয়া নিয়েও স্ত্রীর কাছে নানা কথা শুনতে হয় কিন্তু ইউনিয়নের অফিসে তবু যেতেই হয়। না গেলে ওরা সন্দেহ করবে—সুরেশ নিশ্চয় তলে তলে মালিক পক্ষে যোগ দিয়েছে। ইউনিয়নের অনেকেরই সন্দেহ, কাগজের মালিক সুরেশকে হয়ত সহকারী সম্পাদক করবার লোভ দেখালে সুরেশ রাজি হয়ে যাবে। সুরেশের সে যোগ্যতা আছে যাতে সে দরকার মতো সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখতে পারে, কিন্তু মুখচোরা ভালোমানুষ সুরেশকে কেউ পাত্তা দেয়নি। সম্পাদকীয় বিভাগে অনেক কাজ করিয়ে নেয় তাকে দিয়ে, কতদিন ও টিকা-টিপ্পনি লেখে, স্বনামে বেনামে রবিবারের কাগজে প্রবন্ধ, গল্প লেখে—তার জন্য পৃথক পয়সা পর্যন্ত পায় না। ওই প্রুফ রীডার হিসাবে বাঁধা মাইনে দেড়শ টাকা।

ওদের কাগজ মালিক পক্ষের একগুয়েমির ফলে আজ এক সপ্তাহ বন্ধ। কর্মচারিরা সবাই ধর্মঘট করেছে। সুরেশও ধর্মঘটী। রোজকার মতো সেদিনও সুরেশ ইউনিয়নের অফিসে যায়। বিবৃতি লিখেছেন ইউনিয়ন সম্পাদক, সেটা হ্যাণ্ডবিলে ছাপা হবে, গ্রাহকের বাড়িতে বাড়িতে বিলি করা হবে। সুরেশ মুখ বুজে প্রুফ দেখে দেয়। বানান ভুল শুদ্ধ করে, বাক্যের গঠন ঠিক করে দেয়। প্রুফটা কোন্ প্রেসে যাবে তা পর্যন্ত তার জানবার অধিকার নেই।

ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ তাকে বোধ হয় চেনেনও না। ছোট কর্তারা

অর্থাৎ যারা ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর মাতব্বর হয়েছেন তারাও সুরেশকে এড়িয়ে চলেন। সুরেশের বাড়ীতে অসুখ শুনে কেউ উদ্বিগ্ন হয় না। অসুখ বিসুখ তো হবেই, বিপদ কারও একা আসে না। ধর্মঘট চলতে থাকাকালে কারো সত্যি অসুখ হয়, কেউ বা অসুখের ভান করে। ওসব ট্যাক্‌টিক্‌স জানা আছে।

ওরা সুরেশের কাছ থেকে সরে বসে ফিস্ ফিস্ করে কি গোপন পরামর্শ করে। তার কোন কোন কথা কানে যায়। ওদের পরামর্শের বহর দেখে মনে হয়—বুঝি কাকোড়ি ষড়যন্ত্রের গোপন কাহিনী বলছে। একজনের হাতে একটা মোটর গাড়ীর নম্বর লেখা কাগজ। কথাটা সুরেশও শেষ অবধি শুনতে পায়। কাগজের মালিক মহাশয় বড় লোক, তার কয়েকখানি গাড়ি আছে, ওর মধ্যে কোন্ নম্বরের গাড়িতে তিনি গেলে কি অর্থ হয় সেটা সুরেশের মাথায় আসে না।

সে নিয়মিত ইউনিয়নের অফিসে যায়। সময় পূর্ণ হলে ফিরে আসে। ফিরবার পথে চার আনার মাছ কেনে। ওতে একবেলা চলে না, কিন্তু শুধু মাছের ঝোল ভাত ছাড়া আর কিছু রাঁধবার নেই, বাচ্চাগুলি খাবে কি দিয়ে!

মেয়েটির জ্বর একটু কম পড়ে তো ছেলেটির জ্বর হয়। গলায় ডিপথিরিয়ার 'প্যাচ'। ডাক্তার বলেন—অন্তত পেনিসিলিন দিতে হবে। না হয় পাঠাতে হবে মেডিক্যাল কলেজে। ছুটাছুটিতে ইউনিয়ন অফিসে যেতে দেরী হয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যেই একজন খোঁজ নিতে আসে—সুরেশ বাড়ি আছে কিনা। বাড়ির লোকে বলতে পারে না সুরেশ তখন কোথায়। কিছুক্ষণ পরে আবার চিঠি আসে—অবিলম্বে আফিসের দরোজায় পিকেটিংএ যোগ দাও। সুরেশ অনেক পরে ফিরে এসে সে পত্র পায়। ওর ছেলের অসুখ, তাতে অন্যের কি? ও যদি ইউনিয়ন অফিসে অনুপস্থিত হয়—কে জানে সে মালিক পক্ষের সহায়তা করছে কিনা।

ইউনিয়নে যাওয়ার পথে জব্বারের সঙ্গে দেখা হয়। জব্বার

একজন কম্পোজিটার। সম্পাদক বাবুদের ঘরে যাতায়াত আছে। বল্লে বাবু, শুনে চমকে যাই, আপনার ডিপার্টের লোকই লাগাচ্ছে যে আপনি সহকারী সম্পাদক হবেন আশায় মালিক পক্ষের সাহায্য করছেন। কে বলছে সে নামটা জব্বার বলে না। কিন্তু সুরেশের বুঝতে বাকি থাকে না। ঈর্ষার বিষদংশন দিতে এই দুঃখের দিনেও মানুষ ভোলে না। উত্তর বঙ্গের ভীষণ বন্যায় সুরেশ একবার একটা সাপের সঙ্গে এক বট গাছে আশ্রয় নিয়েছিল, সুরেশকে সেই বিষধর সাপ সেদিন কিছু বলেনি কিন্তু আজ এই চরম দুঃখের দিনে সমদুঃখী আর একজন ধর্মঘটী কি করে এমন মিথ্যা প্রচার করে নিজের স্বভাবের পরিচয় দিচ্ছে। কুৎসা রটিয়ে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করবার এই চরম সুযোগ কুৎসিত লোকে ছাড়তে রাজি নয়।

ইউনিয়ন অফিসে থমথমে ভাব। ওখান হতে ফিরে সুরেশ অফিসের দরোজায় গিয়ে দেখে অনেক লোকের ভিড়। দারুন উত্তেজনা। বাইরের কম্পোজিটর দিয়ে ম্যাটার কম্পোজ করে কাগজ বের করবার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ নাকি রোটারিও চালু হবে। মালিক পক্ষ সরকারের সহায়তায় নাকি কাগজ বের করবে।

শিকাগো শহরে এমনি এক বিরাট সংবাদপত্র-ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল তামাম মজদুর, কোন কাগজের কোন কম্পোজিটর কাজ করলে না, তবু কাগজ বেরুল। সেবার একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল—ফটো কম্পোজিং। যন্ত্রের সাহায্যে ফটো-ফিল্মের উপর কম্পোজ করা বস্তু থেকে ব্লক তৈরী করে তা থেকে কাগজ ছাপা হয়েছিল। এরাও কোন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে নাকি?

ক্রমে বেলা গেল, সন্ধ্যা অতীত হলো, রাত দশটার পর যখন ফটকের ভিড় একটু কমে এলো তখন সত্যি সত্যি রোটারি চলবার শব্দও হল। ইউনিয়নের অফিসে খবর গেল, রোটারি চলছে। সভাপতি সম্পাদকসহ জরুরি কর্মীসঙ্ঘের কয়েকজন উপস্থিত সদস্য টেবিলের উপর ঘুসি মেরে সভা করতে লাগলেন। সংবাদ শুনে সবার অলক্ষে উঠে গেল সুরেশ।

সুরেশের কথা কারো মনে পড়েনি। সবার পিছনে অবহেলিত সে কখন চলে গেল তাও কেউ প্রথম লক্ষ্য করেনি। কিন্তু যখন সভায় প্রস্তাব চলছিল—কে পারে এই রোটারী বন্ধ করে দিয়ে আসতে, তখন সবাই মুখ চাওয়া চাউয়ি করলে। গেটে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন, প্রেস বাড়ির ত্রিসীমানায় কারো ঢুকবার উপায় নেই।

কে একজন বল্লে, আমাদের সুরেশবাবু কৈ রে!

ফুঃ—সম্পাদক মশাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লেন, রোগা পটকা সুরেশবাবুর কর্ম নয়। আমি বলি প্রদ্যোৎবাবু পারেন কিনা—পিছনের জানালার লোহার গরাদ বাঁকিয়ে ঢুকে রোটারি বন্ধ করতে।

প্রদ্যোৎ বল্লে—অসম্ভব। সেখানেও পুলিশ পাহারা আছে। আর তা ছাড়া আমরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও অহিংসভাবে থাকব কথা, এমনভাবে হিংসাত্মক কাজ করা আমাদের আদর্শ-বিরুদ্ধ।

একজন কমিটি মেম্বার গর্জে ওঠেন—রাখুন আদর্শ। এখন কাগজ ছাপা বন্ধ না করতে পারলে কাল কাগজ বেরুলে দুচার জন করে লোক ঢুকতে সুরু করবে, আমাদের ধর্মঘট বানচাল হয়ে যাবে। জান কবুল, তবু কাগজ ছাপা বন্ধ করা চাই।

কিন্তু তার কোন কার্যকরী উপায় নেই। এক যদি বিদ্যুতের তার ছেঁড়ে, না হয় যদি ভূমিকম্প হয় বিহারে যেমন হয়েছিল, কিম্বা যদি কোন বেনামা বিমান থেকে ঠিক এই প্রেসটির উপর একটি বড়ো আকারের বোমা পড়ে, তা ছাড়া তো রোটারি বন্ধের কোন আশা নেই! হায়, এযুগে কি 'মিরাক্‌ল্‌' আর ঘটে না? কর্মপরিষদের শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, কাগজ ওরা ছাপুক, কাল আমরা অবস্থান ধর্মঘট করব যাতে ফটক দিয়ে ভ্যান না বেরুতে পারে—একটি কাগজও বাড়ির বাইরে না যেতে পাবে।

কর্মপরিষদের কাজ চালু থাকার মধ্যেই কিন্তু সহসা এক আশ্চর্য সংবাদ এলো, তাকে 'মিরাক্‌ল্‌' ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কি এক বিকট গর্জন করে রোটারি থেমে গেছে এবং ইলেকট্রিক সার্কিটে

আগুন ধরে প্রেস বাড়ীটাতেই আগুন জ্বলছে। দমকল ডাকা হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবক দৌড়ে এলো, তার চোখেমুখে ভীষণ আতঙ্ক। সে যা সংবাদ বল্লে তা শুনে কর্মপরিষদ উঠে দাঁড়ালো।

ধরা পড়েছে—যে লোক রোটারী বন্ধ করেছে, ইলেকট্রিক সার্কিটে আগুন ধরিয়েছে সে ধরা পড়েছে। কিন্তু জীবিতাবস্থায় নয়—বিদ্যুতের আগুনে সে তক্ষুণি মারা গিয়েছে। সে লোক সেই রোগা পটকা লাজুক সুরেশ। পাশের বাড়ির ছাদ দিয়ে মারাত্মক লাফ দিয়ে প্রেস বাড়ির ছাদে পড়ে সে রোটারি বন্ধ করতে গিয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুতের ব্যাপার সব জানা না থাকায় নিজেও মরেছে, রোটারিকেও নিস্পন্দ করে দিয়ে গেছে।

জঞ্জাল

এতোদিন পরে এ প্রস্তাব শুনবেন আশা করেন নি সুষমা। ছেলে এসে যখন বললে—তুই ভদ্রলোক দেখা করতে এসেচেন, তিনি তাকেই কথা বলতে বলেছিলেন। কিন্তু ছেলের মুখে ঘটনা সব শুনে তিনি খুশি হবেন কি হবেন না ভেবে পেলেন না। ময়লা কাপড়খানা বদলে, অভ্যাসবশত আয়নার সুমুখে একবার দাঁড়িয়ে ছেলের পিছু পিছু নিচে নেবে এলেন।

বসবার ঘরে সোফায় তুই ভদ্রলোক পাশাপাশি বসেছিলেন। সুষমা ঘরে ঢুকতেই তুজনে উঠে দাঁড়ালেন। একজন ছড়ি-শুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার করলেন, অন্যজন ঈষৎ মাথা নোয়ালেন।

ছড়ি হাতে ভদ্রলোকটি যেন চেনা-চেনা ; অনেকবার দেখেচেন সুষমা, কিন্তু নামটা মনে করতে পারলেন না। তিনিই কথা বললেন, আপনি বসুন বৌদি। সুকু তুমিও বসো—বলে সুষমা ও তার ছেলেকে তিনিই বসতে অনুরোধ করলেন। সকলে বসলে তিনি বললেন—আমাকে হয়ত আপনি ভুলে গেছেন বৌদি, আমার নাম সরোজ। দেবেশদা বেঁচে থাকতে কতোবার এসেচি মনে পড়ে কি ? সুকু তখন ছোট—ওর নিশ্চয় মনে নেই।

মনে পড়ল বৈ কি, সুষমার অনেক কথাই মনে পড়ল। স্বামীর বন্ধু সরোজ। কলকাতার কোনও কলেজে বাংলা পড়াতেন, তখন এসে আড্ডা জমাতেন, এলে উঠতে চাইতেন না।

বিহারে চলে গেছলাম, তাঁর মৃত্যু সংবাদ কাগজে দেখে আপনাদের একখানা পত্রও দিয়েছিলাম, কোনও উত্তর পাইনি। উত্তর দেওয়ার কিছু ছিলও না। দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেল। সেই সুকু

কতো বড়ো হয়েচে। আমি তো ওকে দেখে চিনতেই পারিনি। তারপর আপনারা সবাই ভালো আছেন তো ?

কুশল প্রশ্নাদির পর সরোজবাবু সঙ্গীটির পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি আমার বন্ধু সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সিনেমা জগতে একটা নামকরা 'ফিগার'। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রভৃতির অনেক বই ছবি করে সুনাম অর্জন করেছেন। ইনি সম্প্রতি দেবেশদার একখানা উপন্যাসের ছবি তুলতে চান—সেই প্রস্তাব নিয়েই আজ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আপনার অনুমতি চাই।

সুষমা কি উত্তর দেবেন ? তাঁর কি ছাই এসব বৈষয়িক ব্যাপারে কোন বুদ্ধি আছে ? এসব এতকাল দেখেছে ছোট ভাই নরু, নরেন বোস, এডভোকেট। এখন ছেলে বড়ো হয়েছে—ওই দেখুক। নিজে না বোঝে মামাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করুক।

সুষমাকে নীরব দেখে সরোজবাবু বললেন—অবশ্য তার জন্য টাকা দেওয়া হবে। দেবেশদার ব্যাপার, আমার নিজের ঘরের ব্যাপার। তিনি বেঁচে থাকলে দু'পয়সা কম দিলেও দেওয়া যেত। এখন সুকু ছেলেমানুষ, সুতরাং ওকে যা দিতে হবে তা আমাদেরই দেখেশুনে দিতে হবে। আমার বন্ধুটি পুরা দশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। এখন আপনার অনুমতি পেলে আমরা লেখাপড়া করে ফেলতে পারি।

দ—শ— হা—জা-র টাকা! মনে মনে অঙ্কটা আওড়ান সুষমা। প্রকাশকদের বাড়ী হাতচিঠি পাঠিয়ে দশটি টাকা আদায় করতে সুষমার জান বেরিয়ে যায়। তিনি নেহাৎ মেয়েছেলে, তাই বার বার ছেলেকে বলে কয়ে পাঠিয়ে টাকাটা আদায় করেন। কর্তা বেঁচে থাকলে তিনি যে ওঁর মতো বিরক্তি সহ্য করতে পারতেন না এ কথা সুষমা ভালো ভাবেই জানেন।

আঁমতা আমতা করতে থাকেন তিনি। সরোজবাবু বললেন—লেখাপড়া অবশ্য নরেনদাই করবেন। উনি আবার সলিলেরও বন্ধু কিনা, বলে তিনি সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

তবে তো আর কথাই নেই।

সুকুই উৎসাহিত হয়ে জবাব দেয়, মামাবাবুর মত থাকলেই মা মত দেবেন। আপনারা বাবার কোন্ বইটা নিতে চান ?

'অভ্যুদয়'—এবার সলিলবাবুই জবাব দেন। 'বইটা ঠিক যুগোপযোগী হবে। আশা করা যায়, লোকে এ জাতীয় গল্প নেবে। এতে একটা উজ্জ্বল আদর্শ আছে যা দৈনন্দিন দৈন্যদুঃখ গ্লানিসার উর্ধ্বে দৃষ্টি নিয়ে যায়। এমন বইই এখন দরকার।'

চা খেয়ে ওঁরা উঠলেন। সুষমা অনুমতি দেবেন। না দেওয়ার কীই বা কারণ থাকতে পারে এই চমৎকার প্রস্তাবে। এক 'কপি' বই পর্যন্ত প্রকাশকের কাছ থেকে এনে দিতে হবে না। তাও ওঁরাই সংগ্রহ করে সঙ্গে করে এনেছিলেন। কেবল সিনেমা সত্বের জন্য অগ্রিম মূল্য দশ হাজার টাকা। এডভোকেট ভাই এতে আর কি ভাংচি দেবে ?

খেয়ে-দেয়ে সুকু কলেজে গেল। সুষমাও খাওয়া-দাওয়া সেরে উপরে এলেন। এ সময়টা তিনি একটু গড়িয়ে নেন। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস, দুপুরে না গড়ালে তাঁর শরীর অসুস্থ বোধ হয়। সেই তিনি বেঁচে থাকতে এ নিয়ে কতো ঠাট্টা করেছেন—সুষমা তবু না ঘুমিয়ে পারতেন না। আজ কিন্তু ঘুম এলোনা।

মেঝেতে শুয়ে শুয়ে কত কথাই মনে পড়তে লাগল। সুকু ইদানীং যত্ন করে তার বাবার লেখা বইগুলি বাঁধিয়ে এ ঘরের কাচের আলমারিতে এনে রেখেচে। এই দশ বছরে কত কাগজপত্র কোথায় চলে গেছে। কত মাসিক সাপ্তাহিক কাগজ ওজন দরে বিক্রি করে দিয়েছেন, উনুনে আঁচ দিয়েছেন। এই তো সেদিন অনেক দিনের পুরোনো একখানা 'ভারতবর্ষে' একটা গল্প দেখিয়ে সুকু বল্লে, মা—এই দেখ, বাবার লেখা একটা গল্প। এটা কোনো বইতে তোলা হয়নি। এইসব কাটিং সংগ্রহ করে আমি বাবার আর একটা বই বের করব।

কিন্তু লেখাগুলি কোথায় পাবে ? হয়ত সব কাগজই ছিল। সুষমার নির্বুদ্ধিতায় অনাদরে নষ্ট হয়ে গেছে। সুকু তখন ছোট

ছিল, ও কিছু বুঝতে পারত না। সুষমার উচিত ছিল সব গুছিয়ে রাখা। কিন্তু ইচ্ছা হয়নি। বরাবর এই কাগজপত্রকে জঞ্জাল মনে হত। স্বামী যতকাল বেঁচে ছিলেন দু-হাতে জঞ্জাল জমাতেন, সুষমা ঝেঁটিয়েও পরিষ্কার করে উঠতে পারতেন না। লেখকেরা নিজেদের লেখা বই উপহার দিয়ে যেতো, নানা পত্র-পত্রিকা থেকে সমালোচনার জন্য বই আসত, কত বই আদৌ পড়ে দেখবার অবকাশ হত না, তার আগেই সুষমা তা সরিয়ে ফেলতেন, পোড়াতে দিতেন। সমালোচনার জন্য যে সব বই আসত, সমালোচনা লেখা হওয়ার আগে সে সব বই টেবিল থেকে সরালে ঝগড়া-ঝাঁটি হত। না পড়ে কোনও সমালোচনা লেখা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

আর এই পত্রিকা। এই বাংলাদেশে কোথায় যে কতো পত্রিকা বেরোয় তার যেন প্রদর্শনী বসে যেতো। তাই বসে ঘাঁটাঘাঁটি করে কোনটায় তাঁর লেখা বেরুচ্ছে তার 'ফাইল' সংগ্রহ করা—সেই তো একটা লোকের চাকরি। কে করে? সুষমা দু'চার দিন অপেক্ষা করে সব একটা গাদায় ফেলে জড়ো করতেন। মাসান্তে শিশি-বোতলওয়ালা সস্তা দরে কিনে নিয়ে যেত।

তাঁর মৃত্যুর পরে সব কাগজ আসাও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সুকু একখানা মাত্র দৈনিক কাগজ নেয়, সারা বাড়ীতে আর সেই কাগজের ছড়াছড়িও নেই। বড়ি শুকুতে দু'খানা কাগজ আনলে আর ডাল মেলবার কাগজ মেলে না।

বইপত্র জঞ্জাল মনে হত। সুষমার মনে হত, তাঁর স্বামীটি যেন একটি বন্য জীব। নিজের চারিদিকে জঞ্জাল স্তূপীকৃত করে রাখতেই ভালোবাসতেন। কোথায় ঘরবাড়ি দিব্যি ফিটফাট করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হবে; তা নয় বৈঠকখানা থেকে সিঁড়ির ঘর পর্যন্ত বই-পত্রের ছড়াছড়ি। আলমারির মাথাতেও বাঁধানো বই গাদা দেওয়া। দু'হাতে বিলিয়ে দিলেও কমে না। হরদম আসচে। প্রায় প্রতি ডাকেই কিছু-না-কিছু কাগজ যদি আসে তবে কি বিষম সমস্যা বুঝুন, তার উপর বাংলা মাসের প্রথম দিকে মাসিকগুলির ভিড় তো ছিলই।

ছোট বেলায় একটা পাখি পুষেছিল সুকু। তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কি বচসা। বাপ ছেলের দিকে টেনে কথা কইবেনই। মা ঐসব নোংরামি সইতে পারতেন না। পাখিটি খাবে, ছড়াবে, ঘরদোর নোংরা করবে—সে কি কোনও গৃহিণীর পছন্দ হয়? খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পাখিটি উড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সুকুরই ভুল; দরজা খোলা রেখে খাবার আনতে গিয়েছিল। তাই সে ডাকছেড়ে কাঁদতে পারলে না, কিন্তু তার চোখ ছল ছল করতে লাগল। ওর বাবা আশ্বাস দিলেন, আবার রথযাত্রায় পাখি কিনে দেবেন। সুষমা প্রথম বেশ খুশি হয়েছিলেন। বেশ হয়েছে, পাখি গিয়েছে, বারান্দার কোণটা আর নোংরা হবে না। কিন্তু কিছু সময় পরে শূন্য খাঁচাটা দেখে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। মিট-সেফের মাথায় আধখানা পেয়ারা কাটা পড়েছিল, বাকী আধখানা পাখিকে সুকু খেতে দিয়েছিল। ওই আধখানা পেয়ারা দেখে সুষমার মনটা হু হু করে উঠেছিল। আহা, ছিল, এমন কি ক্ষতি করছিল পাখিটা।

ঝগড়াঝাঁটি করলে তিনি বোঝাতেন, যতদিন বেঁচে আছি লোকে ভালোবেসে বইপত্র দেয়, কি করব বলো? যখন মরে যাবো, তখন তোমার বাড়িতে আর কেউ জঞ্জাল আনবে না। ঘরবাড়ি ঝক্‌ঝক্‌ করবে।

স্বামীর মৃত্যুর পরে পুরোনো বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে এসব কথা সুষমার বার বার মনে পড়ত। এই কয় বছরে সংসারের অন্য হাল হয়েছে। ওই জঞ্জালও আর জমে না, ওসব কথা আর মনেও পড়ে না।

কেবল কিছুদিন আগে সুকু যেই তার বাবার বইগুলি উপরের ঘরে কাচের আলমারিতে নিয়ে এলো, সুষমা আবার অভ্যাসবশেই তেড়ে উঠেছিলেন—ওই সব জঞ্জাল আবার টেনে উপরে তুলে এনেছিস। সুকু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেনি, কেবল দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল, আর যাকে জঞ্জাল বলতে চাও বলো, এসব বাবার লেখা। আমি এ ফেলতে দেব না।

সুষমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন—ছেলে বড়ো হয়ে উঠেছে, ষোলো সতের বছরের জোয়ান ছেলে, কলেজে পড়ে, ওকে রুখলে ওতো ছেড়ে কথা কইবে না। ওর বাবা যা সয়েছেন ও তা সইবে না।

ঘুরে ঘুরে এই সব কথাই আজ সুষমার মনে আসতে লাগল। তবে কি স্বামীর মর্যাদা তিনি বোঝেন নি? হয় তো তাই—নতুবা ওই অপরিচিত ভদ্রলোক যে বইখানার এত প্রশংসা করে গেলেন সেই বইখানা এই বাড়িতে, এই ঘরে, ওই পালঙ্কের পরে বালিস বুকে দিয়ে তিনি দিনের পর দিন লিখেছেন, প্রুফ দেখেছেন, আর সুষমা একদিন কৌতূহল বশেও তা পড়ে দেখেননি। মাসে মাসে মাসিকে বেরিয়েছিল, পরে বই আকারে বেরুল। আজ পর্যন্ত তার সময় হয় নি, ইচ্ছা হয় নি, উৎসাহ হয় নি—লেখাটা পড়ে দেখেন। প্রথম যুগের কয়েকখানি বই পড়েছিলেন, তার এক বর্ণও মনে নেই। পরবর্তী সব রচনাই অপঠিত রয়ে গেছে।

মনে হত কাগজপত্র সবই জঞ্জাল। ও লেখাই বা কে পড়বে, ওগুলিও জঞ্জালের সামিল। আর আজ সেই জঞ্জালের একটি অংশ, মাত্র একখানি বই-এর শুধু চিত্রসত্বের জন্য দশ হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে। সবাই তবে ও-গুলিকে জঞ্জাল মনে করে না।

সুষমার দু'চোখ ছাপিয়ে জল নামল। দেওয়ালে ঝুলানো স্বামীর ছবির দিকে তাকালেন,—স্মিতহাস্যে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, স্থিরবুদ্ধি প্রতিভাভাস্বর মূর্তি, কিন্তু চোখের জলে সে মূর্তি ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। সুষমা বালিশে মুখ গুঁজলেন।

উপসংহার

ছায়াচ্ছন্ন দীর্ঘ বারান্দার এক কোণে আরাম-কেদারায় শশিনাথ চুপ করে বসে ছিলেন। বেলা পড়ে আসছে, আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনও এক সময়ে শেষ হয়। আলবোলার তামাক পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারই একটু মৃদু সৌরভ বাতাসে ভাসছে। বেয়ারা দারোয়ান এ দিকটায় এখন কেউ নেই। একটু পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠবে, বাইরে বাগানে রজনীগন্ধার ঝাড়ে গন্ধ ছড়াবে। শশিনাথ নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, যেন তাঁর জীবনের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে।

বেশী দূর নজরে আসে না। তবু বাগানের যতখানি দেখা যায়, জুঁই চামেলী রজনীগন্ধার ঝাড়, তার ওধারে রডোডেনড্রন গাছের শাখাটা দুলছে। শশিনাথ দেশী বিদেশী নানা ফুলের সমাবেশ করেছিলেন বাগানে। ফুলের কেয়ারীর পাশে যে পাথরের বেঞ্চটা পাতা, ওখানে গিয়ে বসলে মনে হত না, কলকাতার জনবহুল রাজ্যে আছেন। দূরে দেওদার সারি। তার সুমুখে অনেকখানি খোলা জমিতে ঘন সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো। তার এধারে সিজন-ফ্লাওয়ারের বেডগুলি, পাশ দিয়ে পায়ে চলার পথ। চারিদিকের গাছপালার আড়ালে মন আপনি নিরিবিলি আশ্রয় খুঁজে পেত। আর বাগানের ঠিক মাঝখানটিতে একটি ফোয়ারা, ফোয়ারার কেন্দ্রে শ্বেত-পাথরের নগ্ন পরীমূর্তি, ইতালীয় ভাস্করের নিপুণ হাতের কাজ। ফোয়ারার জল অনেক দিন আগেই শুকিয়েছিল। যেদিন বসন্তকুমারী মারা গেলেন, সেদিন থেকে শশিনাথও ফোয়ারার কাছে আর যান নি। তবু বারান্দার পাশে প্রিয় কেদারাটিতে বসলে দেখতে পেতেন ওই

পরীটিকে, দেখতে পেতেন বাগানের আরও দু-একটা গ্রীক ভাস্কর্যের নমুনা—বলিষ্ঠ পুরুষমূর্তি হারকিউলিস আর 'থ্রোইং ডিস্‌ক্‌' হাতে একটি ক্রীড়কের মূর্তি। তাদের পেশীর শিরা-উপশিরাগুলি শশিনাথ যেন নিজের বিশাল বাহুর মধ্যে একদা অনুভব করতেন।

সবচেয়ে সুন্দর লাগে ওঁর ড্রয়িং-রুমের সুমুখে পাথরের মানুষটিকে; হাঁটুর উপরে কনুই রেখে, হাতের পাতায় হাত ঠেকিয়ে লোকটি ভাবছে। বিশ্বের যত জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই মানুষ চিন্তার মাধ্যমেই আবিষ্কার করেছে। প্রাণী-জগতের মধ্যে মানুষই একমাত্র জীব, যে ভাবে, ভাবতে পারে, আর ভাবতে পারে বলেই তার যা কিছু সভ্যতা-সংস্কৃতি সব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। শিল্পী রদাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই 'থিংকার'—শশিনাথ অনেক টাকা খরচ করে প্যারিস থেকে করিয়ে আনিয়েছিলেন, প্রতিমূর্তিটিতেও রদাঁর স্পর্শ যেন সজীব হয়ে আছে।

বিদেশ থেকে স্মৃতিচিহ্ন কত কিছু এনেছিলেন তিনি। বসন্তকুমারী হাসতেন। বলতেন, বাড়িঘর যে তুমি জাদুঘরে পরিণত করলে! তোমার এই চিত্রশালা আর ভাস্কর্যের সংগ্রহ একদিন তোমারই ঘাড়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বেঁচে থেকে দেখে গেলেন না, কিন্তু শশিনাথ দীর্ঘ দিন পরে আজ সেই কথাগুলি স্মরণ করছেন। বহুকাল এদের সাহচর্যে থেকে থেকে মনে হয়েছে, এরাও যেন এই বড় বাড়ির আর দশজন বাসিন্দার মতই নিতান্ত আপন। রাফাএল, মাইকেল এঞ্জেলো, বত্তিচেলি, রেমব্রাণ্ট, ল্যাণ্ডশীয়র, বার্ন জোন্‌স্‌, অর্পান, আলমা ট্যাডোমা—এঁরা আর দূর দেশের মানুষ নন। শিল্পরসিক শশিনাথ প্রতিটি বাছাই-করা জিনিস সংগ্রহ করেছেন। যেখানে মূল মেলে নি, প্রতিলিপি প্রতিমূর্তি করিয়ে এনেছেন। দিনে দিনে সংগ্রহ বেড়ে গেছে, তবু আগ্রহের শেষ নেই।

ক্লান্ত পদে উঠে দাঁড়ালেন শশিনাথ। বারান্দায় আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। দূরে দেউড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে, সেখানে দারোয়ানরা জটলা করছে। ঘাস-ঢাকা প্রকাণ্ড লনটি নির্জন। কেবল থেকে থেকে রজনীগন্ধার গন্ধ ভেসে আসছে।

বৃদ্ধ ভৃত্য বেহারী এসে বারান্দায় আলো জ্বেলে দিল, বলল, চা আনব ?

সন্ধ্যা হয়েছে, গরম চা মন্দ লাগবে না। কিন্তু এমন এক উদাস অনুভূতি শশিনাথকে ভর করেছে যে কিছু আর তাঁর ভাল লাগছে না। আজ পুত্রের পত্র পেয়েছেন—সে এ বাড়িতে আসতে চায় না। মনটা তাঁর সেই অবধি খারাপ হয়ে আছে।

বেহারী আদেশের অপেক্ষা না করে চা নিয়ে এল। পরিচিত মনোরম গন্ধে শশিনাথ ফিরে তাকালেন। আবার এসে বসলেন কেদারায়। চায়ে‍ র পেয়ালা হাতে নিয়ে বললেন, তুই এ বাড়িতে কত দিন এসেছিস বেহারী ?

ইদানীং এ প্রশ্নের জবাব বহুবার দিয়েছে বেহারী। হিসাব মুখস্থ হয়ে গেছে, বলল, চল্লিশ বছর হবে কর্তা।

হুম্—একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শশিনাথ চায়ের পেয়ালা টিপয়ে রাখলেন।

চল্লিশ বছর হয়ে গেল। বেহারী এ বাড়ীর প্রথম থেকেই আছে। ছোকরা চাকরটি এসেছিল, এখন সে বৃদ্ধ হয়েছে। বাড়িটিও পুরোণো হয়েছে বই কি ! ফাটল ধরেছে কার্নিসে, বড় বড় থামগুলোর মাথায় চুনসুরকির কাজ কোথাও কোথাও ঝরে পড়েছে। প্রকাণ্ড গাড়ি-বারান্দার উপরে ফোকরগুলিতে পায়রা বাসা বেঁধেছে। গাড়ি-বারান্দার এক পাশে শশিনাথের প্রথম মোটর গাড়িখানি জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। ওটা আর বের করে ফেলবার কথা কারও মনে হয় নি। দীর্ঘ দিন থেকে থেকে ওটাও যেন গাড়ি-বারান্দার আশ্রিত হয়ে গেছে। গাড়ী-বারান্দার দুপাশে বসন্তকুমারী শখ করে চীনা তালগাছ লাগিয়েছিলেন, মরতে মরতেও টিকে আছে তারা। দিনের বেলা ঘুরে ঘুরে দেখেন শশিনাথ, কাউকে কিছু বলেন না, কেবল মনের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে।

ভেনাস। কালো পাথর কুঁদে তৈরী নিখুঁত নারীদেহের অবয়ব—পীন পয়োধর, কোমল গ্রীবা, চিক্কণ চিবুক, কেবল হাত ভেঙে গেছে।

ভেঙে গেছে ব'লেই মনে হয় যেন সেই প্রাচীন ভেনাস মূর্তিটিই। মূর্তিটির পাশে শশিনাথ দাঁড়ালেন এসে। মনে পড়ল, পুত্র পশুপতি আজ লিখেছে, এই সব মূর্তি আর চিত্রের কোন সুব্যবস্থা করা তার সাধ্যের অতীত। হয়তো সে বাস্তববুদ্ধি দিয়ে ঠিকই বুঝেছে—এত বড় বাড়ি আর এত বৃহৎ ঐশ্বর্যসম্ভার সামলানো সামান্য উপার্জনের ব্যারিস্টারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে কি এ সব ফেলে দেওয়া যায়, না, ফেলে দেওয়া উচিত? পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সংগৃহীত এই বিচিত্র শিল্পসম্ভার তো কেবল পারিবারিক সম্পদ নয়, এ যে দেশের সম্পদ, জাতির সম্পদ! আর যে সব দুষ্প্রাপ্য মূল চিত্র ও ভাস্কর্য তাঁর কাছেই কেবল আছে, তা বিনষ্ট হলে সমগ্র মানব-সভ্যতার পক্ষেই যে তা অপূরণীয় ক্ষতি!

শশিনাথের বাবা বিদেশে যান নি, কিন্তু প্রাচীন জমিদারদের ঐতিহ্য অনুযায়ী বিদেশী শিল্পীদের আঁকা দামী দামী তৈলচিত্র দিয়ে নিজের বৈঠকখানা সাজিয়েছিলেন। বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠনের সঙ্গে ওই সব গৃহসজ্জা একদিন লাট-বেলাটের মনোরঞ্জন করেছে। শশিনাথ বাবার শখ পুরো মাত্রায় পেয়েছিলেন, তার উপর তাঁর ছিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা। ফলে তিনি যখন বিদেশভ্রমণে গেলেন, নিয়ে এলেন নানা দেশের সেরা চিত্রকর আর ভাস্করের কাজের সংগ্রহ। যেখানে মূল জিনিস আনতে পারেন নি, প্রতিলিপি ও প্রতিমূর্তি তৈরি করিয়ে এনেছেন। এ কাজ শুধু বিদেশে নয়, স্বদেশেও করেছেন। ফলে ভেরাশ্চেকিন, নিকোলাস রোয়েরিক, বতিচেলির সঙ্গে বাঁধা পড়েছে রাজপুত, কাংরা, মোগল চিত্র থেকে কালীঘাটের পটুয়ার হাতের কাজ। সংস্কৃত পুথির সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন বিচিত্রিত শাহনামা আর আরবী অক্ষরে লেখা চিত্রবহুল রামায়ণ। অর্থের সার্থক ব্যবহার করেছিলেন তিনি বহু দেশের বহুবিধ শিল্পবস্তু সংগ্রহ করে—চীন জাপান রুশ জর্মন কেউ তাঁর সংগ্রহ থেকে বাদ যায় নি।

এক খেদ ছিল শশিনাথের। ডক্টর আনন্দকুমারস্বামী তাঁকে লিখেছিলেন আমেরিকায় যেতে। পশুপতি তখন বিলেতে

ব্যারিস্টারি পড়তে গেছে, শশিনাথও বিদেশে গেলে জমিদারি দেখে কে? তাই আর তাঁর আমেরিকায় যাওয়া হয়ে ওঠে নি, কিন্তু ভারতীয় শিল্পশৈলীর আলোচনায় আনন্দকুমারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁর। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ইংলণ্ড আমেরিকার কয়েকটি শিল্পপত্রিকায় কিছু কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু সে সবই আনন্দের খোরাক। এ ব্যাপারে অজস্র অর্থ ব্যয় করা ছাড়া আয় করবার কথা ভাবেন নি কোনদিন। ভাবেন নি অর্থের অভাবে কোনদিন এগুলি সংরক্ষণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। পিতা যে বিস্তৃত জমিদারি রেখে গিয়েছিলেন, তাতে দু হাতে অপচয় করলেও দশ পুরুষ চলতে পারত। অন্য কোন বদখেয়ালে অপচয়ের প্রবৃত্তি ছিল না শশিনাথের, তাই দিনে দিনে পুথিপত্র, চিত্র ও ভাস্কর্য সংগৃহীত হয়েছে বিস্তর।

একমাত্র পুত্র পশুপতি ব্যারিস্টার, পাটনায় প্রাক্‌টিস করে। ওখানেই নিজের পছন্দমত বাড়ি ঘর করেছে। মায়ের মৃত্যুর পর বাবাকে সে নিজের কাছে নিয়ে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু শশিনাথ রাজী হন নি। জমিদারি বাংলা দেশে, তাঁর গোমস্তা কর্মচারী ঝি চাকর দারোয়ান এবং আশ্রিত ও পোষ্য-অধ্যুষিত এই বিরাট বাড়িতে কি কেবল বসন্তকুমারীর স্মৃতি? এখানেই যে তাঁর সারা জীবনের সংগ্রহ! কত দেশের কত জনের স্মৃতি!

বেহারী বৃদ্ধ হয়েছে তবু সে-ই তাড়াহুড়া করে চাকরদের দিয়ে মাঝে মাঝে সব ঝাড়পোছ করায়। বসন্তকুমারী যতদিন বেঁচে ছিলেন, কোন জিনিসটির এতটুকু অযত্ন হয় নি, ঝুল লাগে নি, ধুলা জমে নি। তারপর হল দেশবিভাগ। জমিদারির বেশীর ভাগ পড়ল পাকিস্থানে। আদায়পত্র যাও বা হয় তার এক পয়সাও শশিনাথের হাতে পৌঁছায় না। ও-পারের কড়ি এ-পারে আসে না। অর্থাভাব তখন থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু পশুপতিকে কিছু জানান নি শশিনাথ। পশ্চিমবঙ্গেও জমিদারি যাবে শুনেছিলেন। শেষে তাও গেল। লোকজন কমাতে হল, পুরনো গোমস্তাদের বিদায় দেবার

সময় যাকে যতটা পারলেন পুষিয়ে দিলেন শশিনাথ। কিন্তু যারা বছরের পর বছর চুপ করে দাঁড়িয়ে শশিনাথের সংসারের এই পরিবর্তন দেখেছে, সেই মূক চিত্র ও মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে শশিনাথ শিউরে ওঠেন। এদের তিনি কি করবেন? প্রাণ ধরে দিতে পারবেন না কাউকে, দাম দিয়ে নেওয়ার লোকই বা কোথায়? পাটনার পাট মিটিয়ে পশুপতি চলে আস্থক। সে না থাকলে এই বড় বাড়ি আর জিনিসপত্র দেখাশোনা করবে কে?

পশুপতি বাবার প্রস্তাবের অস্থবিধাগুলি বুঝিয়ে জবাব দিয়েছে। কলকাতায় এসে আইনব্যবসায়ে সে যদিও বা গুছিয়ে নিতে পারে, ওই বাড়ি আর বাবার বেসাতি সে বইতে পারবে না। এখন তো আর বিস্তৃত জমিদারির আয় নেই যে, অত বিশাল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। বরং শশিনাথ যদি পাটনায় যান তবে পশুপতি তাঁর কোন অস্থবিধাই ঘটতে দেবে না। চিঠিখানা পেয়ে অবধি বার বার বসন্তকুমারীর পরিহাস মনে পড়ছে শশিনাথের—এ সব একদিন বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। আজ শশিনাথের সত্য মনে হচ্ছে এই মূল্যবান শিল্পবস্তু-সংগ্রহ যেন ভারী পাথরের মত তাঁর গলায় বেঁধে কে ঝুলিয়ে দিয়েছে আর তাই তাঁকে অসহায়তার গভীর অতলে টেনে নাবিয়ে নিচ্ছে।

রাত হল। শশিনাথ বৈঠকখানায় এসে অভ্যাসমত বসলেন। মৃদু আলো এসে পড়েছে ম্যাডোনা চিত্রের গায়ে। সহসা চমকে উঠলেন শশিনাথ—দেওয়াল বেয়ে একটা সাপ নামছে, কালো লিকলিকে। কিন্তু সাপটা নড়ছে না তো! চশমাটা পুঁছে ভাল করে তাকালেন তিনি, জ্বেলে দিলেন তিন-চারটে আলো। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলেন সাপ নয় ওটা, একটা উইয়ের ঢিপির রেখা, মাটি তুলে দেওয়াল ফুঁড়ে নেমে এসেছে 'লাস্ট সাপার' ছবিটার পিছনে। কি জানি ছবিটাতেই উই লেগেছে কি না! এ পাশের দেওয়ালে যামিনী গাঙ্গুলীর পদ্মা, অবনীন্দ্রনাথের উমা, গগনেন্দ্রনাথের কিউবিজম্, নন্দলালের নটীর পূজা, ক্ষিতীন মজুমদারের জগাই

মাথাই। যামিনী রায়ের 'মা' পটচিত্রটির উপরে মাকড়সা জাল বুনেছে।

নির্জন বৈঠকখানায় সহসা শশিনাথ চতুর্দিকে প্রেতের নৃত্য দেখতে পেলেন। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নয় শুধু, তাঁর প্রাণপ্রিয় বস্তুগুলির উপর প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। ধ্বংসের হাত উচিয়ে আসছে চতুর্দিক হতে। শশিনাথ তাঁর দুর্বল শিথিল হস্তে কোন্‌টিকে ঠেকাবেন? জোরালো আলোর দিকে তাকাতে তাঁর চোখ ঝলসে গেল। তাঁর চোখের সুমুখেও যেন মাকড়সা জাল বুনতে লাগল, উই ইঁদুর আরশুলা আর গুবরে পোকায় কুরে কুরে খেতে লাগল তাঁর মস্তিষ্কেব কেন্দ্রকোষ। ম্যাডোনার মুখখানা মসীবর্ণ হয়ে গেল, ভেনাসের ভাঙা হাত থেকে পাথর ঝরে ঝরে যেন একটা স্তন খসে গেল। হারকিউলিসের মুণ্ডটা গড়াগড়ি যেতে লাগল ফোয়ারার পরীটার পায়ের কাছে, আর ভেরাশ্চেকিনের সিপাহী-বিদ্রোহের চিত্রটির সৈন্যরা যেন সঙ্গিন উচিয়ে এগিয়ে এল শশিনাথের দিকে। রদাঁর 'থিংকার' ঘুরপাক খেতে খেতে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল, আর একটা প্রবল অট্টহাসির সঙ্গে প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস যেন গর্জন করে ছুটে এল। সে বেগ শশিনাথ সইতে পারলেন না, মেঝেতে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বৈঠকী গল্প

সরস গল্প

কৌতুক যৌতুক

পরিচয়

স্ট্রাইক

*

পাণ্ডুলিপি

*

একতারা

*

১৩৫০ সাল

উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

কর্মবীর কার্তিকচন্দ্র

ধ্রুবের গল্প

প্রহ্লাদের গল্প

সাবিত্রী সত্যবানের গল্প

নল-দময়ন্তীর গল্প (যন্ত্রস্থ)